সূচিপত্র

মাসিক

তর্জুমানুল হাদীস

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৯ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
আগস্ট-২০২৬

সূচিপত্র

মাসিক

তর্জমানুল হাদীস

রেজি নং ডি.এ.১৪২

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদক মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহিমাহুল্লাহ)

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত জুলাই ২০২৬ মাসের সালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা	তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা
০১.০৮.২৬	০৪:০৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০৪	১৬.০৮.২৬	০৪:১৬	১২:০৩	০৩:৩০	০৬:৩১	০৭:৫০
০২.০৮.২৬	০৪:০৭	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪১	০৮:০৩	১৭.০৮.২৬	০৪:১৬	১২:০৩	০৩:৩০	০৬:৩০	০৭:৪৯
০৩.০৮.২৬	০৪:০৮	১২:০৫	০৩:২৯	০৬:৪০	০৮:০২	১৮.০৮.২৬	০৪:১৭	১২:০৩	০৩:২৯	০৬:২৯	০৭:৪৮
০৪.০৮.২৬	০৪:০৮	১২:০৫	০৩:৩০	০৬:৪০	০৮:০১	১৯.০৮.২৬	০৪:১৭	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৮	০৭:৪৭
০৫.০৮.২৬	০৪:০৯	১২:০৫	০৩:৩০	০৬:৩৯	০৮:০১	২০.০৮.২৬	০৪:১৮	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৮	০৭:৪৬
০৬.০৮.২৬	০৪:১০	১২:০৫	০৩:৩০	০৬:৩৮	০৮:০০	২১.০৮.২৬	০৪:১৮	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৭	০৭:৪৫
০৭.০৮.২৬	০৪:১০	১২:০৫	০৩:৩০	০৬:৩৮	০৭:৫৯	২২.০৮.২৬	০৪:১৯	১২:০২	০৩:২৯	০৬:২৬	০৭:৪৪
০৮.০৮.২৬	০৪:১১	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:৩৭	০৭:৫৮	২৩.০৮.২৬	০৪:২০	১২:০১	০৩:২৯	০৬:২৫	০৭:৪৩
০৯.০৮.২৬	০৪:১২	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:৩৬	০৭:৫৭	২৪.০৮.২৬	০৪:২০	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৪	০৭:৪২
১০.০৮.২৬	০৪:১২	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:৩৬	০৭:৫৬	২৫.০৮.২৬	০৪:২১	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২৩	০৭:৪১
১১.০৮.২৬	০৪:১৩	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:৩৫	০৭:৫৫	২৬.০৮.২৬	০৪:২১	১২:০১	০৩:২৮	০৬:২২	০৭:৪০
১২.০৮.২৬	০৪:১৩	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:৩৪	০৭:৫৪	২৭.০৮.২৬	০৪:২২	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২১	০৭:৩৯
১৩.০৮.২৬	০৪:১৪	১২:০৪	০৩:৩০	০৬:৩৩	০৭:৫৩	২৮.০৮.২৬	০৪:২২	১২:০০	০৩:২৮	০৬:২০	০৭:৩৮
১৪.০৮.২৬	০৪:১৫	১২:০৩	০৩:৩০	০৬:৩৩	০৭:৫২	২৯.০৮.২৬	০৪:২৩	১২:০০	০৩:২৭	০৬:১৯	০৭:৩৭
১৫.০৮.২৬	০৪:১৫	১২:০৩	০৩:৩০	০৬:৩২	০৭:৫১	৩০.০৮.২৬	০৪:২৩	১২:৫৯	০৩:২৭	০৬:১৮	০৭:৩৬
						৩১.০৮.২৬	০৪:২৪	১১:৫৯	০৩:২৭	০৬:১৭	০৭:৩৫

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিট পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

সূচিপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক مجلة ترجمان الحديث الشهرية

রেজি নং ডি.এ.১৪২

৩য় পর্ব

তর্জুমানুল হাদীস

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র

مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش

৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

আগস্ট ২০২৬ ঈসায়ী

সফর-রবিঃ আউয়াল ১৪৪৮ হিজরী

শ্রবন-ভাদ্র ১৪৩৩ বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
শাইখ মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

প্রবাস সম্পাদক
শাইখ মুহাম্মাদ আজমাল হুসাইন মাদানী

ব্যবস্থাপক
চৌধুরী মুমিনুল ইসলাম

সহকারী ব্যবস্থাপক
মো: রমযান ভূঁইয়া

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ.কে.এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. মো: লোকমান হোসেন
শাইখ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
শাইখ মুফায্যল হুসাইন মাদানী
প্রফেসর ড. মো: মতিউর রহমান
মো: জামাল হোসেন
ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী
মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রউফ মাদানী
শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী

যোগাযোগ :
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
ফোন : +৮৮০২-২২৪৪৫৮৫৫১
ব্যবস্থাপক : ০১৯১৬-৭০০৮৬৬
মোবাইল : ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮ (অফিস)

সার্কুলেশন বিভাগ
বিকাশ: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

ই-মেইল : tarjumanulhadeethbd@gmail.com
www.jamiyat.org.bd
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth

মূল্য : ২৫/- [পঁচিশ টাকা মাত্র]

مجلة ترجمان الحديث الشهرية
মাসিক
তর্জুমানুল হাদীস
রেজি নং ডি.এ.১৪২
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক মুখপত্র
مجلة البحوث العلمية الناطقة بلسان جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث ببنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠
الهاتف : ٨٨٠٢-٢٢٤٤٥٨٥٥١+ الجوال : ٠١٧٦١٨٩٧٠٧٦
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي (رحمه الله تعالى)،
المشرف العام للمجلة: الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق السلفي،
رئيس التحرير: محمد هارون حسين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং-২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায় (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ	৩৬০/-	১৮০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২০ ইউ.এস. ডলার	১০ ইউ.এস. ডলার
সাউদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	২৫ ইউ.এস. ডলার	১২ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	২২ইউ.এস. ডলার	১১উ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৮ ইউ.এস. ডলার

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০,০০০/-
শেষ প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৭০০০/-
৩য় প্রচ্ছদ অর্ধ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৪০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	২৫০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	১২০০/-

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
❖ ফিতনা ও ফাসাদের সময়ে উম্মতের করণীয়।...............৩
দারসুল কুরআন
❖ হাদীসের আলোকে মুসলিমদের ঐক্য, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা।..৪
শাইখ মুহাম্মদ ইব্রাহিম মাদানী
দারসুল হাদীস
❖ জামা'আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা................৬
শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
প্রবন্ধ :
❖ রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন : অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র.১১
আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী
❖ সালাফ চরিত।...১৩
শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
❖ ইসলামিয় দাওয়াহর রূপরেখা, গুরুত্ব ও ফযীলত।............১৫
ড. রেজাউল করিম মাদানী
❖ মুদ্রা ব্যবসায়-এর বিধান।......................................১৮
মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রউফ বিন আইয়ুব আলী মাদানী
❖ কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন।.................২১
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব
❖ নির্মল হৃদয়।..২৫
শাইখ ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ
❖ তাফসীরের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী বর্ণনার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা।...২৮
আব্দুর রউফ
❖ বাংলাদেশে কাদিয়ানিদের বিস্তার ও সাংগঠনিক ইতিহাস।....৩৩
আহমাদ বিন আব্দুস সালাম
শুব্বান পাতা
❖ যোগ্য নেতৃত্ব ও আজকের ইয়াং জেনারেশন.................৩৫
মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম
❖ আদম (আ:) ও মানব ইতিহাসের সূচনা ৩৮
আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন
❖ ফাতাওয়া ও মাসায়েল।...৪৩

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় الافتتاحية

ফিতনা ও ফাসাদের সময়ে উম্মতের করণীয়

বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহ নানামুখী ফিতনা, বিভ্রান্তি, মতভেদ, গুজব, সহিংসতা এবং নৈতিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন। এমন পরিস্থিতিতে একজন মুসলিমের করণীয় কী-এ বিষয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। অতএব আবেগ, দলীয় আনুগত্য বা গুজবের অনুসরণ নয়; বরং ওহির আলোকে পথ চলাই মুমিনের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ "তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" *(সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১০৩)*

আল্লাহ আরো বলেন : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ 'হে মুমিনগণ! কোনো পাপাচারী যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তোমরা তা যাচাই করে নাও'। *(সূরা আল-হুজুরাত আয়াত : ৬)*

আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে যাচাই-বাছাই ছাড়া সংবাদ প্রচার করা বড় ধরনের ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সংবাদ যাচাই করা ইসলামী দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : «إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ» 'সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে'। *(সুনান আবু দাউদ, হাদিস : ৪২৬৩; সহীহ)*

আল্লাহ আরো বলেন : «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ» "অরাজকতা ও ফিতনার সময় ইবাদত করা আমার কাছে হিজরত করার সমতুল্য।" *(সহীহ মুসলিম, হাদিস : ২৯৪৮)*

এ কারণে ফিতনার সময় অধিক ইবাদত, তাওবা, দোয়া, কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনই মুমিনের প্রধান কর্মসূচি হওয়া উচিত।

সালাফে সালেহীনও ফিতনার সময় সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম আয-যুহরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : 'ফিতনা যখন আসে তখন আলেমরাও তা চিনতে পারেন না; আর যখন চলে যায় তখন সবাই তা চিনতে পারে'।

এ উক্তি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ফিতনার সময় তাড়াহুড়ো করে অবস্থান গ্রহণ না করে ইলম, প্রজ্ঞা ও তাকওয়ার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অতএব ফিতনা ও ফাসাদের সময় মুসলিম উম্মতের করণীয় হলো-

১. কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা।
২. আলেমে রব্বানীদের পরামর্শ অনুসরণ করা।
৩. গুজব ও অপপ্রচার থেকে বিরত থাকা এবং সংবাদ যাচাই করা।
৪. অন্যায়, জুলুম ও রক্তপাত থেকে দূরে থাকা।
৫. মুসলিমদের ঐক্য রক্ষা করা এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বর্জন করা।
৬. বেশি বেশি ইবাদত, দোয়া, ইস্তিগফার ও ধৈর্যের আশ্রয় নেয়া।
৭. ন্যায়, ইনসাফ ও উত্তম চরিত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া।

সবশেষে, ফিতনা থেকে মুক্তির একমাত্র নিরাপদ পথ হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সহীহ সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা। ব্যক্তি, দল বা মতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়; বরং দলিলের অনুসরণই একজন মুমিনের পরিচয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে প্রকাশ্য ও গোপন সকল ফিতনা থেকে হেফাজত করুন এবং কুরআন-সুন্নাহর ওপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

দারসুল কুরআন/ من دروس القرآن

হাদীসের আলোকে মুসলিমদের ঐক্য, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহমর্মিতা

শাইখ মুহাম্মদ ইব্রাহিম মাদানী ❖
পি এইচ ডি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا و رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ!

আজকের দারসের বিষয় হলো- মুসলিম সমাজে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব রক্ষায় সন্দেহ, গুপ্তচরবৃত্তি ও গীবত থেকে বেঁচে থাকার কুরআনিক নির্দেশনা। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অধিকাংশ সামাজিক বিভেদ, পারিবারিক কলহ এবং মুসলিমদের পারস্পরিক শত্রুতার মূল কারণ হলো- অমূলক সন্দেহ, অন্যের গোপন বিষয় অনুসন্ধান এবং গীবত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ ধারণা ও সন্দেহ থেকে বিরত থাক। নিশ্চয় কিছু ধারণা পাপ। তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করবে। অতএব আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।'[১]

প্রথম শিক্ষা : কুধারণা থেকে বেঁচে থাকা।

আল্লাহ বলেন- 'তোমরা অধিকাংশ ধারণা থেকে বিরত থাক।'

অর্থাৎ প্রমাণ ছাড়া কোনো মুসলিম সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

'নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তর- প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।'[২]

অতএব যাচাই-বাছাই ছাড়া কারো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়।

দ্বিতীয় শিক্ষা : গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্যের গোপন বিষয় অনুসন্ধান নিষিদ্ধ।

আল্লাহ বলেন- ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ 'তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না।'

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন অনুসন্ধান করা, মোবাইল, বার্তা বা ব্যক্তিগত বিষয় তল্লাশি করা, দোষ খুঁজে বেড়ানো ইসলামের শিক্ষা নয়।

আল্লাহ আরো বলেন-

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾

'আল্লাহ প্রকাশ্যে মন্দ কথা বলা পছন্দ করেন না।'[৩]

তৃতীয় শিক্ষা : গীবতের ভয়াবহতা।

আল্লাহ গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এটি এমন একটি উপমা, যা মানুষের অন্তরকে কাঁপিয়ে দেয়।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ . قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا قُلْتَ لِأَخِيكَ مَا فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيهِ فقد بهته.

❖ফাতাওয়া ও গবেষণাবিষয়ক সেক্রেটারী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও দাঈ, ধর্ম মন্ত্রণালয় সৌদি আরব, বাংলাদেশ অফিস।

[১] সূরা আল-হুজুরাত আয়াত : ১২।

[২] সূরা আল-ইসরা আয়াত : ৩৬।

[৩] সূরা আন-নিসা আয়াত : ১৪৮।

বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ ﷺ সহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? সহাবীগণ বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি ﷺ বললেন : তোমার মুসলিম ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা তার কাছে খারাপ লাগবে। জিজ্ঞেস করা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সে ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, তুমি যে দোষ-ত্রুটির কথা বললে, তার মধ্যে সে দোষ-ত্রুটি থাকলেই তো তুমি গীবত করলে। আর যদি দোষ-ত্রুটি বর্তমান না থাকে, তবে তুমি "বুহ্তান" (মিথ্যারোপ) করলে।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যদি তুমি তোমার ভাইয়ের এমন দোষের কথা বলো, যা তার মধ্যে রয়েছে, তবে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তার সম্পর্কে এমন দোষের কথা বলো, যা তার মধ্যে নেই, তবে তুমি তার প্রতি "বুহ্তান" (মিথ্যা অপবাদ) দিলে।[৪]

চতুর্থ শিক্ষা : খবর যাচাই করার গুরুত্ব :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾

'হে ঈমানদারগণ! কোনো ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা যাচাই করো।'[৫]

বর্তমান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে এই আয়াতের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে।

পঞ্চম শিক্ষা : মুসলিম ভ্রাতৃত্ব রক্ষা।

আল্লাহ বলেন-﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ 'নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।'[৬]

রাসূল ﷺ বলেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَخُونُهُ، وَلاَ يَكْذِبُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ، التَّقْوى هاهُنَا، بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ». رواه الترمذي، وَقَالَ: حديث حسن.

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মিথ্যা বলবে না (বা মিথ্যাবাদী ভাববে না), তার সাহায্য না করে তাকে অসহায় ছেড়ে দেবে না। এক মুসলিমের মর্যাদা, মাল ও খুন অপর মুসলিমের জন্য হারাম। তাকওয়া এখানে (অন্তরে) রয়েছে। কোনো মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করাটাই একটি মানুষে খারাপ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।"[৭]

ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করা, তার দোষ প্রচার করা বা তাকে হেয় করা ঈমানের দাবির পরিপন্থী।

ষষ্ঠ শিক্ষা : ক্ষমা ও তাওবা।

এই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ বলেন-

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ যে ব্যক্তি গীবত, কুধারণা বা গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছে, সে যেন আন্তরিকভাবে তাওবা করে এবং মানুষের হক নষ্ট করে থাকলে তা যথাসম্ভব সংশোধন করে।

করণীয় : সর্বদা মুসলিম ভাই সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করা।

কোনো খবর শুনে যাচাই করা ছাড়াই প্রচার করা।

গীবতের আসর থেকে উঠে যাওয়া বা তা বন্ধ করার চেষ্টা করা।

অন্যের গোপন বিষয় অনুসন্ধান না করা।

নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা।

আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তিগফার করা।

উপসংহার :

আজ মুসলিম সমাজের অনেক অশান্তির মূল কারণ হলো- কুধারণা, গীবত, অপবাদ এবং গোপন বিষয় অনুসন্ধান। যদি আমরা সূরা আল-হুজুরাতের এই মহান নির্দেশনাগুলো বাস্তব জীবনে অনুসরণ করি, তবে পরিবার, সমাজ ও উম্মাহর মধ্যে ভালোবাসা, ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কুধারণা, গীবত, অপবাদ ও গুপ্তচরবৃত্তি থেকে হেফাজত করুন। আমাদের অন্তর ও জিহ্বাকে পবিত্র রাখুন এবং মুসলিমদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব অটুট রাখার তাওফীক দান করুন।

[৪] মিশকাতুল মাসাবীহ হা : ৪৮২৮।

[৫] সূরা আল-হুজুরাত আয়াত : ৬।

[৬] সূরা আল-হুজুরাত আয়াত : ১০।

[৭] হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

সূচিপত্র

দারসুল হাদীস/من أحاديث الرسول

জামা'আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদা

শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী❖

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَفِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ: إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ" - متفق عليه

হাদীসের অনুবাদ : সহাবী আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তির জামা'আতের সাথে সালাতের সওয়াব তার নিজের ঘরে ও বাজারে আদায়কৃত সালাতের সওয়াবের চেয়ে পঁচিশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, সে যখন উত্তমরূপে ওযু করলো, অতঃপর একমাত্র সালাতের উদ্দেশ্যে মাসজিদে রওয়ানা করলো, তখন তার প্রতি কদমের বিনিময়ে একটি মর্তবা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। সালাত আদায়ের পর সে যতক্ষণ নিজ সালাতের স্থানে থাকে ফেরেশতাগণ ততক্ষণ তার জন্য এ বলে দু'আ করতে থাকেন- 'হে আল্লাহ! আপনি তার ওপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।' আর তোমাদের কেউ যতক্ষণ সালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সালাতে রত থাকে বলে গণ্য হয়।[৮]

রাবী পরিচিতি : আলোচ্য হাদীসের রাবী বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা, আব্দুর রহমান বিন সখর আদদাউসী আয্যাহরানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন, অতঃপর নাবী ﷺ-এর সাহচর্যে জীবনের সবটুকু সময় উৎসর্গ করেন। এ কারণে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ পান। তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা প্রায় ৫৩৭৪টি।

তিনি ৫৭, ৫৮ বা ৫৯ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। বাকী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে সম্মানজনক মাকাম দান করুন।

জামা'আতে সালাত আদায়ের মর্যাদা :

জামা'আতে সালাত আদায়ের যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমন বড় ধরনের মর্যাদাও রয়েছে। এ মর্মে নিম্নে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হল।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

আব্দুল্লাহ বিন ওমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : একাকী সালাতের চেয়ে জামা'আতে সালাত আদায় করা সাতাশগুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ।[৯]

উল্লেখ্য যে, মূল আলোচ্য হাদীসে এসেছে পঁচিশগুণ, আর এ হাদীসে এসেছে সাতাশগুণ। বাহ্যিকভাবে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হলেও মূলত কোনো দ্বন্দ্ব নেই, কারণ সাতাশের মধ্যেই রয়েছে পঁচিশ সংখ্যাটি। এছাড়াও বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে রয়েছে, অথবা সালাতের মান ভেদে অথবা জায়গার মান ভেদে, অথবা দূরত্বভেদে অথবা মুসল্লির সংখ্যা ভেদে ২৫/২৭ হয়ে থাকে। ওয়াল্লাহু আলাম।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً.

আবু সাঈদ খুদুরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করলে পঁচিশবার (একাকী) সালাতের সমান

❖সহ-সভাপতি বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।

[৮] সহীহ বুখারী হা. ৬৪৭, সহীহ মুসলিম হা. ৬৪৯।

[৯] সহীহ বুখারী হা. ৬৪৫, সহীহ মুসলিম হা. ৬৫০।

সাওয়াব পাওয়া যায়। আর যখন খোলা মাঠে উন্মুক্ত জায়গায় পরিপূর্ণ রুকু, সাজদা আদায় করে সালাত হয় তা পঞ্চাশবার (একাকী) সালাতের সমান সওয়াব পাওয়া যায়।[১০]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضى الله عنه ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ.

উসমান বিন আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে উযু করে, অতঃপর ফরয সালাতে যায় এবং মানুষের সাথে মসজিদে জামা'আতে সালাত আদায় করে, তাহলে তার অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আযানে এবং প্রথম কাতারে কী (মর্যাদা) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত, যা লটারী ছাড়া লাভ করা যাবে না তাহলে অবশ্যই লটারী করে লাভ করত। যুহরের সালাত প্রথম সময়ে আদায় করার মধ্যে কী (মর্যাদা) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর ঈশা ও ফজরের সালাত (জামা'আতে) আদায়ের কী (মর্যাদা) তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা হাজির হত।[১২]

عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضى الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

উসমান বিন আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ঈশার সালাত আদায় করে, সে যেন অর্ধরাত পর্যন্ত ইবাদত করল, আর যে ব্যক্তি ফজর সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করল সে যেন পূর্ণরাত ইবাদত করল। (অর্থাৎ ঈশা ও ফজর জামা'আতে আদায় করলে পূর্ণরাত ইবাদত করার সাওয়াব পাওয়া যায়)।[১৩]

জামা'আতে সালাত আদায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক হাদীস এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি! আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেই। তারপর সালাতের আযান দেয়ার জন্য হুকুম করি এবং একজনকে লোকদের ইমামতি করতে বলি। এরপর আমি জামা'আতে আসেনি এমন লোকদের কাছে যাই আর তাদেরসহ তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেই। আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে তার শপথ করে বলছি, যদি তারা জানত যে, একটি মাংসবহুল হাড় কিংবা দুটি বকরীর ক্ষুর পাবে তাহলে তারা এশার জামা'আতে অবশ্যই হাজির হতো।[১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى، دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ».

[১০] আবু দাউদ হা : ৫৬০, ইবনু মাজাহ হা : ৭৮৮ হাসান।
[১১] সহীহ মুসলিম হা : ২৩২।
[১২] সহীহ বুখারী হা : ৬১৫, সহীহ মুসলিম হা : ৪৩৭।
[১৩] সহীহ মুসলিম হা : ৬৫৬।
[১৪] সহীহ বুখারী হা : ৬৪৪, সহীহ মুসলিম হা : ৬৫১।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন অন্ধলোক নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমার এমন কোনো পথপ্রদর্শক নেই, যে আমাকে মসজিদে নিয়ে যাবে। সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নিজ ঘরে সালাত আদায় করার অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। যখন ঐ ব্যক্তি চলে যাচ্ছিলেন তখন তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তার উত্তর দাও (অর্থাৎ জামা'আতে উপস্থিত হও)।[১৫]

এ জাতীয় আরো বহু হাদীস রয়েছে। এসব থেকে যেমন জামা'আতে সালাত আদায়ের মর্যাদা জনা যায়, তেমনি জামা'আতের গুরুত্বও প্রমাণিত হয়।

জামা'আতে সালাত আদায়ের বিধান :

পুরুষদের জামা'আতে সালাত আদায়ের বিধানে বহু মতামত পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুটি মত:

প্রথম মত : জামা'আতে ফরয সালাত আদায় করা পুরুষদের জন্য ফরযে আইন। অর্থাৎ সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে জামা'আতে ফরয সালাত আদায় করতে হবে, না হলে বড় গুনাহ হবে। তবে শরিয়তসম্মত ওজর থাকলে ভিন্ন কথা। এ মতের প্রবক্তা হলেন সাহাবী ইবনু মাসঊদ (রাঃ), আবূ মুসা (রাঃ); আতা, আওযায়ী, ইমাম আহমাদ, ইবনু হযম। ইমাম ইবনু তাইমিয়া এ মত গ্রহণ করেছেন। অবশ্য জামা'আত ছাড়া সালাত হবে কিনা এ বিষয়ে কিছু ভিন্ন মতামত রয়েছে। তারা দলীল হিসেবে পেশ করেন।

﴿ وإذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ..... ﴾

আর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে, তখন তাদের সালাত কায়িম করবে.... ।[১৬]

জামা'আতে সালাতের এ নির্দেশ হলো যুদ্ধের পরিবেশে, তাহলে স্বাভাবিক পরিবেশে আরো অগ্রাধিকার পায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ "

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! আমার ইচ্ছা হয়, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দেই, তারপর সালাত কায়েমের নির্দেশ দেই, এরপর সালাতের আযান দেয়া হোক, তারপর এক ব্যক্তিকে লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দেই। এরপর আমি লোকদের কাছে যাই এবং তাদের (যারা সালাতে শামিল হয় নাই) ঘর জ্বালিয়ে দেই। যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! যদি তাদের কেউ জানত যে, একটি মাংসহীন মোটা হাঁড় বা ছাগলের ভালো দুটি পা পাবে তাহলে অবশ্যই সে ইশার জামা'য়াতেও হাযির হত।[১৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ . فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ " هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ " . فَقَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَأَجِبْ "

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক অন্ধ লোক নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কেউ নেই। অতঃপর তাকে বাড়ীতে সালাত আদায় করার অনুমতি প্রদান করার জন্য সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আবেদন জানাল। তিনি ﷺ তাকে বাড়ীতে সালাত আদায় করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু যে সময় লোকটি ফিরে যেতে উদ্যত হলো তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন? তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও? সে বলল, হ্যাঁ (আমি আযান শুনতে পাই)। নবী ﷺ বললেন : তাহলে তুমি মসজিদে আসবে।[১৮]

[১৫] সহীহ মুসলিম হা : ৬৫৩।
[১৬] সূরা আন-নিসা আয়াত : ১০২।
[১৭] সহীহ বুখারী হা : ৬৪৪, সহীহ মুসলিম হা : ৬৫১।
[১৮] সহীহ মুসলিম হা : ৬৫৩।

এছাড়াও আরো অনেক দলীল রয়েছে।

দ্বিতীয় মত : পুরুষদের জন্য জামা'আতে ফরয সালাত আদায় করা ফরযে আইন নয়। এমতের প্রবক্তা জমহুর আলেমগণ- অর্থাৎ হানাফী, মালেক ও শাফেয়ীগণ- অবশ্য ফরযে কিফায়া, না সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এ ক্ষেত্রে পরস্পরে মতভেদ রয়েছে। এ মতের পক্ষে দলীল-

১.

عَنْ أَبِي مُوسَى رضى الله عنه ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ، فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي، ثُمَّ يَنَامُ.

আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন: সালাতে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি সওয়াব লাভ করবে, যে অনেক দূর থেকে মসজিদে আসে। অনুরূপ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জামা'আতে সালাতের জন্য অপেক্ষা করবে, সে তার চেয়ে অধিক বেশি সওয়াব লাভ করবে, যে আগেই সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে যাবে।[১৯]

এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, জামা'আতে সালাত আদায় করলে অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু অপরাধ হবে না সুতরাং ফরযে আইন নয়।

২. ইয়াযীদ বিন আল আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত দুই সাহাবীর ঘটনার হাদীস, যারা তাদের বাড়িতে সালাত আদায় করে মসজিদে এসেছিলেন এবং মসজিদে সালাত পড়েননি। তখন নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে বললেন :

لا تفعلا، إذ صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة.

তোমরা এরূপ কর না, যদিও তোমরা তোমাদের বাসায় সালাত আদায় কর, অতঃপর যখন জামা'আতে মসজিদে আসবে, তখন তাদের সাথে আবার সালাত পড়, কেননা এটা তোমাদের জন্য নফল হবে।[২০]

[১৯] সহীহ বুখারী হা : ৬৫১, সহীহ মুসলিম হা : ৬৬২।
[২০] তিরমিযী হা : ২১৯, সহীহ।

এ মতের পক্ষে আরো বেশ কিছু দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে।[২১]

প্রাধান্যযোগ্য মত :

শাইখ আবু মালিক কামাল সালিম উভয় পক্ষের দলীলসমূহ পর্যালোচনা করে বলেন, আমরা উভয় পক্ষের দলীলসমূহ একত্র করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, জামা'আতে সালাত আদায়ের বিধান হলো ফরযে কিফায়াহ। এটাই মধ্যম অবস্থান এবং ইনসাফপূর্ণ। তবে ওজর ছাড়া জামা'আত তরক করা উচিত নয়। ওয়াল্লাহু আলাম।[২২]

মেয়েদের ক্ষেত্রে জামা'আতে সালাতের বিধান :

মেয়েদের ক্ষেত্রে জামা'আতে সালাত আদায় করার কোনো নির্দেশ আসেনি। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই, সকলে একমত। তবে নিরাপদ পরিবেশ হলে নারীদের জামা'আতে অংশগ্রহণের অনুমতি রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ছিল, যা মসজিদে নববী ও মক্কার হারামে আজও চলমান রয়েছে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا.

উম্মু সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন সালাতে সালাম শেষ করতেন তখন কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন, এমন সময়ে মহিলা মুসল্লিরা বের হয়ে যেতেন।[২৩]

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ.

তোমরা আল্লাহর বান্দিদের আল্লাহর মসজিদে যেতে বারণ কর না।[২৪]

সুতরাং মার্জিত পরিবেশে, মর্জিত বেশে নারীদের পুরুষদের জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে অসুবিধা নেই।

[২১] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।
[২২] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৫০৮ পৃ.।
[২৩] সহীহ বুখারী হা : ৮৭০।
[২৪] সহীহ বুখারী হা : ৯০০।

অনুরূপভাবে মেয়েরা মেয়েদের জায়গায় কোনো মেয়ের ইমামতিতে সালাত আদায়েও কোন বাঁধা নেই। যেমন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ফরয সালাতে মেয়েদের ইমামতি করতেন। তিনি কাতারের মধ্যখানে দাড়াতেন।[২৫]

যে সমস্ত ওজরে জামা'আত ছাড় রয়েছে :

সাধ্যপক্ষে পুরুষদের ফরয সালাত মসজিদে জামা'আতে আদায় করতে হয়। তবে কিছু শরীয়তসম্মত ওজরের কারণে ছাড় রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

১. বৃষ্টি, পানি-কাদা, যার কারণে মসজিদে যাওয়া কষ্টকর।[২৬]

২. প্রচণ্ড শীত, যা খুব কষ্টদায়ক। [২৭]

৩. অসুস্থতা, যে অসুস্থতার কারণে মসজেদে যেতে অক্ষম, অপারগ।[২৮]

৪. ভয়-ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা।[২৯]

৫. ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য উপস্থিত হলে।[৩০]

৬. পেসাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দিলে।[৩১]

৭. কাঁচা পিয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধ জাতীয় কিছু খেলে। [৩২]

ইত্যাদি বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য।

হাদীসের শিক্ষা :

আলোচ্য হাদীস হতে একাধিক শিক্ষা পাওয়া যায়, যা নিম্নরূপ :

১. পুরুষদের ক্ষেত্রে ফরয সালাত একাকী পড়া উচিত নয় বরং জামা'আতের সাথে পড়তে হবে।

২. জামা'আতে সালাত আদায় করলে ২৫ থেকে ২৭ গুণ সওয়াব বেশি পাওয়া যায়।

৩. শুধু সালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে গেলে এবং সুন্দরভাবে বাসা থেকে অযু করে বের হলে প্রতি কদমে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং একটি অপরাধ মোচন হয়।

৪. বাসা থেকে অযু না করে বাইরে এসে অযু করলে উক্ত মর্যাদা পরিপূর্ণ পাওয়া যাবে না।

৫. পবিত্র হয়ে এসে মসজিদে জামা'আতে সালাত আদায় করলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে অযু অবস্থায় থাকবে তার জন্য আল্লাহর ফেরেশতাগণ বিশেষভাবে দু'আ করতে থাকেন। তারা বলেন, হে আল্লাহ! তাকে দয়া কর। তাকে রহম কর।

৬. সালাতের পরে অযু ছুটে গেলে, অন্য কর্মে ব্যস্ত হলে অথবা মুসাল্লা থেকে বের হয়ে গেলে ফেরেশতার দু'আ বন্ধ হয়ে যাবে।

৭. মসজিদে এসে সালাতের অপেক্ষায় থাকলে সালাতের সওয়াব পেতে থাকবে।

৮. বড় জামা'আতে রুকু-সিজদা পূর্ণ ও সুন্দরভাবে আদায় করে সালাত পড়লে পঞ্চাশগুণ সালাতের সাওয়াব হবে।

৯. যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযু করে মসজিদে এসে ফরয সালাত জামা'আতে পড়বে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

১০. ঈশার সালাত ও ফজর সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করলে সারারাত ইবাদতের সাওয়াব পাওয়া যায়।

১১. এ ছাড়াও জামা'আতে সালাত আদায় করলে সামাজিক সম্প্রীতি, বন্ধন ও ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। মনের সংকীর্ণতা দূর হয়ে প্রশস্ততা তৈরি হয়।

উপসংহার :

উপসংহারে বলা যায়, সালাত নারী-পুরুষ সকলের জন্য অপরিহার্য্য ইবাদত। আর এ সালাত পুরুষদেরকে জামা'আতের সাথে আদায় করার নির্দেশনা। ফলে শারীরিক, মানসিক, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উপকার সাধন হয়। জামা'আতব্যবস্থা যেন মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের সেতুবন্ধন। অতএব আমরা জামা'আতে সালাত আদায়ে সচেষ্ট হব। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

[২৫] আব্দুর রাযযাক ৩/১৪১ পৃ. সহীহ।
[২৬] সহীহ বুখারী হা : ৬৬৬।
[২৭] মুসনাদ আহমাদ, ৪/২২০, সহীহ।
[২৮] সহীহ বুখারী হা : ৬৬৪।
[২৯] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৫১৩।
[৩০] সহীহ বুখারী হা ৬৭৩।
[৩১] সুনান আবু দাউদ হা : ৮৮।
[৩২] সহীহ বুখারী হা : ৮৫৪।

প্রবন্ধ / المقالة

রাজকীয় মেহমান হিসেবে হজ্জ পালন: অনুপম অনুভূতির লেখচিত্র

আবু সা'দ ড. মোঃ ওসমান গনী❖

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হজ্জ একটি অসাধারণ ইবাদত। আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম প্রতিটি মানুষের জন্য জীবনে একবার হজ্জ পালন করা ফরজ। ইহ-জাগতিক মায়া-মমতা ত্যাগ করে শ্রষ্টার নৈকট্য অর্জনের অভিষ্ট লক্ষ্যে বায়তুল্লাহ গমন সন্দেহাতীতভাবে আনন্দের, কিন্তু ত্যাগের। নাবীর বাচনিক উদ্ধৃতি সূত্রে অবগত হওয়া যায়, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে হজ্জ পালন করলো এবং অশ্লীল ও পাপাচার থেকে বিরত থাকলো, সে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে।[৩৩]

হজ্জ পালন দুনিয়াবী জীবনে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের লক্ষ্যে নিঃসন্দেহে দুর্লভ সুযোগ। আর এ সুযোগ যদি বারে বারে আসে তবে কতই না আনন্দের! রাসূল ﷺ বলেছেন, 'এক উমরাহ থেকে পরবর্তী উমরাহ পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফফারা হয়। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।'[৩৪]

মেহমান হিসেবে হজ্জ পালনের দুর্লভ সুযোগ তো এমনি হয় না। যার ঘর দেখার জন্য যাওয়া তার তো অনুমতি প্রয়োজন। তদুপরি সুন্নাত হিসেবে খাদেমুল হারামাইনের আহ্বান আর একটি বিষয়। ছোটকালে আমার পিতা হাজি মো. সেতাবউদ্দিনের (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিকট প্রায় শুনতাম, একবার দেশ ছাড়ো, মক্কা দেশে যাও/দেখিয়া খোদার ঘর নয়ন জুড়াও। হ্যাঁ, সুপ্রিয় পাঠকমণ্ডলী! নয়ন জুড়ানোরই বিষয়, কাবা ঘর আল্লাহর সর্বপ্রথম ইবাদত ঘর এবং অত্যন্ত বরকতময় স্থান। কাবাদর্শন ঈমানকে শক্তিশালী করে এবং আল্লাহর মহিমা উপলব্ধিতে সহায়তা করে।

পবিত্র কাবা প্রতিটি মুসলিমানের নিকট মহাকাব্যতুল্য। এর মহিমা শুরু হয়, কিন্তু শেষ হবার নয়। প্রায় ঘনক (Cube) আকৃতির কাবা ঘরটির উচ্চতা প্রায় ১৩.১ মিটার, দৈর্ঘ্য ১১.০৩ মিটার এবং প্রস্থ ১২.৮৬ মিটার ব্যাপ্তির অনিন্দ সুন্দর কাঠামো বিরাজমান। মক্কার গ্রানাইট পাথর ও কাঠের বিমের ওপর নির্মিত ছাদ, সোনার আবরণযুক্ত ২ মিটার উঁচুতে দরজা দারুণরকমের শোভাবর্ধন করছে। সোনালী সুতা দিয়ে কুরআনের আয়াত খচিত কালোরঙের রেশমি কাপড় অসাধারণ পবিত্রতার ঝিলিক মানুষের মনে অন্য রকম প্রভাব বিস্তার করে।

স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি কোনো জটিল প্রক্রিয়ার সৃষ্টি নয়; কিন্তু স্থাপত্যশিল্পের ব্যাকরণে এটির নির্মাণ ইতিহাস ও বর্তমানকালেও অপরূপ অবয়বে টিকে থাকা একটা দারুণ ব্যাপার। ইসলাম প্রচারের সূচনাভূমি এ বায়তুল্লাহর চত্বর কতই না মধুর। পায়ের আঘাতে জমজমের সৃষ্টি এবং তা জগতবাসীর নিকট মহান প্রভুর রহমতের নমুনা আজো আমাদের উদ্বেলিত করে।

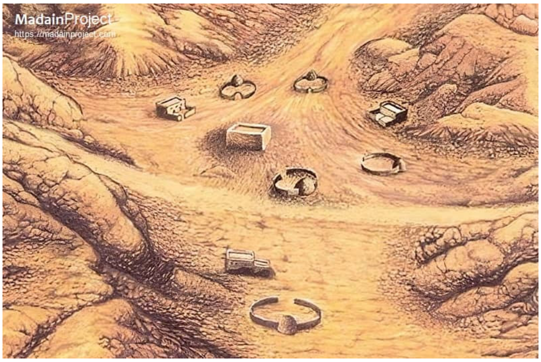

(সুপ্রাচীনকালে বায়তুল্লাহর চিত্র)

বায়তুল্লাহ চত্বরে একটি বড় কুল গাছ (Lote tree) ছিল। ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) মা হাজেরাকে শিশু ইসমাইলসহ ঐ গাছের নিচে রেখে এসেছিলেন। যেহেতু উপত্যকা সে কারণে প্রায় চতুর্দিক ছিল পর্বতময়। এমনি একটি ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ভূমি যা কার না দেখতে ইচ্ছা করে।

❖ ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৩৩] সহীহ বুখারী হা : ১৫২১; সহীহ মুসলিম হা : ১৩৫০।

[৩৪] সহীহ বুখারী হা : ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম হা : ১৩৪৯।

আমরা যথারীতি প্রাণ উজাড় করে এ ভূমিকেও ভূমির সমস্ত স্থাপনাকে লক্ষ্য করেছি। জাড়িয়ে ধরেছি। লক্ষ্য করেছি হিজরতের পথনকশা। সম্ভবত আজ থেকে অন্তত ২৩ বছর আগে আল্লাহর মেহেরবানীতে হজ্জ পালনের সুযোগ এসেছিলো। সেবার কিন্তু, ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। মাটি ও পাথর খননের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পানি জমা হতে দেখেছি। আমি এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, এটি জমজমের পানি নয়। আমার জিজ্ঞাসা এমনটিই ছিল। আমরা তখন জমজমের পানি ব্যবহারের জন্য দু'টো ইনার কম্পার্টমেন্ট দেখেছি। একটি মহিলা ও অন্যটি পুরুষের ব্যবহারের জন্য। উত্তোলিত পানির কুপ দর্শনের দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল। দেখেছি একজন অপারেটর সেখানে বসে থেকে পানি উত্তোলনের প্রক্রিয়া দেখভাল করছেন। চতুর্দিক হতে ধেয়ে আসা পানিপ্রবাহ। কিন্তু ওই খননকৃত জায়গায় যায়নি; আল্লাহর কুদরতেই বেহেশতী ঝর্ণা বেয়ে শুধুমাত্র জমজমেই নিপতিত হয়, অন্য কোথাও নয়।

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! পানির পবিত্রতা কিংবা পবিত্র করার উপকরণ পানি এটি সব ধর্মেই স্বীকৃত। হিন্দুধর্মেও তা দেখা যায়। হিন্দু ধর্মে সপ্তনদীর (অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, স্বরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী) পানি অতিপবিত্র। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী এসব নদীতে স্নান বা ধর্মীয় আচার সম্পাদন আধ্যত্মিক পূণ্য লাভের একটি মাধ্যম। অনেক সময় তারা কৃত্রিম উপায়ে পানি সরবরাহ করে পবিত্রতার প্রলেপ দিয়ে থাকে। আমার গ্রামের বাড়ির মাইল তিনেক পূর্বে গোরকই ধাম। সেখানে হিন্দুরা প্রতি বছর পূণ্যস্নানে আসেন। একটি কুয়া থেকে নারকেলের ডাব্বা দিয়ে পানি তোলেন। একদিন কৌতূহলবশত ওই পানির উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখি, পর্দার আড়ালে কিছু হিন্দু শ্রমিক টিউবওয়েল থেকে পানি সরবরাহ করছেন। মজার বিষয় হলো, তারা অনেক অবুঝ পূণ্যর্থীদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, যে এই পানি বিশেষ পানি!

আর মুসলমানদের পূণ্যভূমির জমজম সম্পূর্ণ আলাদা। উভয় দিকে সাগর, দক্ষিণে সাগর, উত্তরেও সাগর। অথচ পানি সুপেয়। কোনোভাবেই পানির যোগান কৃত্রিমভাবে নয়। এ পানির খাদ্যমান (Food value) এতই যে, একজন মানুষ ত্রিশ দিন পর্যন্ত ওই পানি পান করে বেঁচে থাকতে পারে। এতদসম্পর্কে বিখ্যাত সাহাবি আবু যর আল-গিফারীর একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : 'আমি ত্রিশদিন ত্রিশরাত (মক্কায়) অবস্থান করেছি। এসময় আমার জন্য জমজমের পানি ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য ছিল না। এতে আমি এতটাই মোটাতাজা হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমার পেটের ভাজে চর্বি জমে গিয়েছেল। আমি ক্ষুধার কোনো দুর্বলতাও অনুভব করিনি।'[৩৫]

জমজমের পানি ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীর অন্যতম বরকতময় ও মর্যাদাপূর্ণ পানি। এটি আল্লাহ ত'আলার বিশেষ নিদর্শন। হাজার হাজার বছর আগে আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস সালাম তাঁর স্ত্রী হযরত হাজেরা আলায়হিস সালাম ও শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম- কে মক্কার এই জনমানবহীন উপত্যকায় রেখে যান। শিশুর তৃষ্ণা কাতর অবস্থায় আল্লাহর রহমতে জমজমের ঝরনা উৎসরিত হয়, যা আজও বহমান।

বায়তুল্লাহ, জমজম কুপ, মাকামে ইব্রাহিম, হাতিম ইত্যকার বিষয় দেখবার জন্য চর্তুদিক থেকে মানুষ ধেয়ে আসেন।

সর্বক্ষণ মেহমানদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে থাকে বায়তুল্লাহর চত্বর। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

---

[৩৫] সহীহ মুসলিম প্রসঙ্গ।

সালাফ চরিত

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)

অনুবাদ ও সংগ্রহ : শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী ❖

পর্ব-৫ম

কাদিসিয়ার যুদ্ধ : আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর দুই সেনাবাহিনী কাদিসিয়ায় মিলিত হলো। যখন দুই সেনাবাহিনী মুখোমুখি হলো, তখন সা'দ অসুস্থতার কারণে অশ্বারোহণে অক্ষম হয়ে পড়লেন। তিনি একটি গদিতে হেলান দিয়ে বসে সেনাবাহিনীকে পর্যবেক্ষণ ও তার কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। তিনি যুদ্ধের নেতৃত্ব খালিদ ইবনে আরফাতার হাতে অর্পণ করেন। খালেদ ছিলেন মুসলিম সেনাপতিদের মধ্যে অন্যতম চৌকশ বীর যোদ্ধা। খালেদ সেনাবাহিনীর নের্তৃত্ব দিচ্ছিলেন আর সা'দ তার তাঁবু থেকে পত্র আদান-প্রদান করার মাধ্যমে সার্বিক বিষয় তত্ত্বাবধান করছিলেন। জারির ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালিকে ডান পার্শ্বের এবং কায়েস ইবনে মাকশুহকে বাম পার্শ্বের দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। ঐদিকে মুগীরা বিন শু'বা সিরিয়াতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে শরীক হওয়ার পর একদল সেনাবাহিনী নিয়ে ইরাকে এসে সা'দের সাথে যোগদান করলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে, মুসলিমদের সৈনিকের সংখ্যা ছিল ৭ থেকে ৮ হাজার। আর পারস্য সেনাপতি রুস্তমের সৈনিক সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। সা'দ জনগণকে নিয়ে যোহরের সালাত আদায় করলেন। তারপর তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করলেন। এরপর তিনি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

"আর আমি যাবূর কিতাবে উপদেশের পর লিখে রেখেছি যে, এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে আমার সৎকর্মশীল বান্দারা"।[৩৬] এরপর ক্বারীরা জিহাদ সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত ও অধ্যায় পাঠ করলেন। তারপর তিনি চারবার তাকবীর বললেন এবং চতুর্থবার তাকবীর দেওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধ তিন দিন ধরে চলেছিল। চতুর্থ দিনের সকালে তারা প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলো। সারাদিন চললো। এমনকি রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলমান ছিল। উভয় পক্ষের অনেক লোক নিহত হলো। এভাবে একটানা তিনদিন যুদ্ধ চলতে থাকলো। চতুর্থদিন সকাল বেলা তুমুল যুদ্ধ হলো। এ যুদ্ধে মুসলিমদের ঘোড়াগুলো পারস্যদের হস্তীবহর দেখে পালিয়ে যেতে চাইলো। কারণ এর আগে মুসলিমদের ঘোড়াগুলো কখনো হস্তীবহর দেখে অভ্যস্ত ছিল না। তাই এগুলো দেখে অশ্বগুলো হাতীগুলোর কাছাকাছি না গিয়ে পালিয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু মুসলিমরা সা'দের নির্দেশে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে পারস্যদের হাতিগুলোর চক্ষু উপড়িয়ে ফেললো এবং হাতীগুলোকে হত্যা করতে সক্ষম হলো। হস্তীগুলোর ওপর আরোহীদেরকেও হত্যা করে ফেললো। এই দিনগুলোতে একদল সাহসী মুসলিম বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তাদের মধ্যে তুলাইহা আল-আসাদি, আমর ইবনে মা'দি কারব, কা'কা' ইবনে আমর, জারির ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালি, দিরার ইবনে খাত্তাব, খালিদ ইবনে আরফাতা অন্যতম। এই দিন যখন মধ্যাহ্ন হলো, তখন একটি প্রবল বাতাস শুরু হলো। এতে পারস্যদের তাঁবুগুলোকে তাদের জায়গা থেকে উড়িয়ে দিলো ও সেনাপতি রুস্তমের সিংহাসন উল্টিয়ে ফেলে দিলো। এটি ছিল ১৫ হিজরির শা'বান মাসের ঘটনা। তবে এই তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। যাই হোক, রুস্তম দ্রুত তার খচ্চরের পিঠে চড়ে পালিয়ে গেলেন কিন্তু মুসলিমরা তাকে ধরে ফেললো এবং হত্যা করলো। তারা কাদিসিয়া সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী ইসনিক জালিনাসকেও হত্যা করলো এবং পারস্যরা সমূলে পরাজিত হলো। শিকলবন্দী অবস্থায় ত্রিশ হাজার পারস্যবাসীকে হত্যা করা হয় এবং যুদ্ধে সাত হাজার পারস্যবাসী নিহত হয়। এর আগেও অনুরূপ সংখ্যক পারস্য সেনা মুসলিমদের হাতে নিহত হয়। অপরদিকে আড়াই হাজার মুসলিম নিহত হয়।

'মাদায়েন' বিজয় এবং জালুলার যুদ্ধ : সা'দ যুহরাহ ইবনুল হুওয়াইয়াহ তামিমিকে একটি সৈন্যদলসহ পশ্চিম 'মাদায়েন'-এর 'বাহরাসির' বা 'নাহরাশির' অবরোধ করার জন্য পাঠান। পারস্য সেনাপতি শিরজাদ একটি শান্তিচুক্তি এবং কর প্রদানের চুক্তি করার জন্য মুসলিমদের সাথে 'সাবাত' নামক স্থানে মিলিত হন। এরপর সা'দ তার সেনাবাহিনী নিয়ে 'মুযলিম সাবাত' নামক স্থানে অগ্রসর হন, যেখানে তিনি 'জুন্দ বুরান' নামক একটি পারস্য সেনাবাহিনীর দেখা পান, যাদের সাথে 'মুকাররাত' নামক একটি বিশাল সিংহ ছিল। হাশিম ইবনে উতবা এগিয়ে গিয়ে সিংহটিকে

❖ সহকারী সম্পাদক, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস, ও মুহাদ্দিস মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।

[৩৬] সূরা আল-আম্বিয়া আয়াত : ১০৫।

হত্যা করেন। এরপর মুসলিমরা পারস্যদের আক্রমণ করে এবং তাদের পরাজিত করে। তারপর তারা ১৫ হিজরির যুল-হজ্জ মাসে নাহরাশিরে শিবির স্থাপন করে। সা'দ পারস্য সৈন্যদের খোঁজার জন্য সব দিকে সৈন্যদল পাঠালেন, কিন্তু কৃষক ছাড়া আর কাউকেই খুঁজে পাওয়া গেলো না। সা'দ তাদের মধ্যে প্রায় এক লাখ লোককে একত্রিত করলেন এবং তাদের ভাগ্য সম্পর্কে উমারের মতামত জানতে চেয়ে চিঠি লিখলেন। উমর উত্তরে লিখলেন, যে কৃষক তোমাকে সাহায্য করেনি এবং নিজের জমিতে রয়ে গেছে, সে তোমার সুরক্ষার অধীনে থাকবে। আর যারা পালিয়ে যাবে এবং তুমি তাদের ধরতে পারবে, তাদের সাথে তোমার ইচ্ছা মতো আচরণ করতে পারো। সা'দ তাদের মুক্তি দিলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তারা জিজিয়া (কর) প্রদান করতে রাজি হলো। সা'দ নাহরাশির অবরোধ বজায় রাখলেন এবং দুই মাস ধরে তা আরো কঠোর করতে থাকলেন, যতক্ষণ না পারস্যরা শান্তির অনুরোধ জানিয়ে একটি বার্তা পাঠায় এবং প্রস্তাব দেয় যে, টাইগ্রিস নদী মুসলিম ও পারস্য অঞ্চলের মধ্যে সীমান্ত হিসেবে কাজ করবে। মুসলিমরা তা প্রত্যাখ্যান করলো এবং পারস্যরা তাদের সম্পদ নিয়ে রাতের অন্ধকারে নদীপথে নদীর অপর পারে মাদায়েনে চলে গেলো। তারা 'নাহরাশির' শহরকে জনশূন্য করে রেখে গেলো। এরপর মুসলিমরা শহরে প্রবেশ করলো।

১৬ হিজরির সফর মাসে সা'দ যখন নাহরাশির জয় করেন, তখন তিনি জানতে পারলেন যে, ইয়াজদেগার্ড তার জিনিসপত্র ও সম্পদ নিয়ে মাদায়েন থেকে হুলওয়ানে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করছে। টাইগ্রিস নদীর বন্যা এবং মুসলিমদের নদী পার হওয়ার মতো নৌযানের অভাব থাকা সত্ত্বেও সা'দ মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প করলেন। তিনি আসিম ইবনে আমর তামিমি এবং ছয়শ' অশ্বারোহীকে নদীর অপর তীরে গিয়ে তা রক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করলেন, যাতে মুসলিম সেনাবাহিনী পারস্যদের আক্রমণের শিকার না হয়ে নদী পার হতে পারে। আসিম ও তার সঙ্গীরা ঘোড়ায় চড়ে নদী পার হন। উল্লেখ্য যে, এটি ছিল কাদেসিয়ার যুদ্ধে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ও মুসলিম বাহিনীর অন্যতম কারামত। পারস্যরা আসিমের দলকে পার হতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। আসিম ও তার দল নদী পার হয়ে পারস্যদের তীর থেকে পিছু হটিয়ে দেয়, যতক্ষণ না মুসলিম সেনাবাহিনী নদী পার হতে সক্ষম হয়। মুসলিম সেনাবাহিনী পারস্যদের ধাওয়া করে মাদায়েনে প্রবেশ করে এবং শহরটিকে জনশূন্য অবস্থায় পায়। কারণ ইয়াজদেগার্ড তার পরিবার এবং যা কিছু সঙ্গে নিতে পেরেছিল তা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। শ্বেত প্রাসাদ ছাড়া মুসলিমরা আর কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি, যেখানে কিছু যোদ্ধা নিজেদের সুরক্ষিত করেছিল। তাদেরকে আত্মসমর্পণ করার জন্য তিনদিন সময় দেওয়া হয়েছিল এবং তৃতীয় দিনে তারা তা করতে রাজি হয়েছিল। সা'দ 'খোসরো'-এর প্রাসাদে প্রবেশ করে সেটিকে একটি সালাত আদায়ের কক্ষে রূপান্তরিত করেন। তিনি মাদায়েনে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন এবং সৈন্যদের পরিবারবর্গকে শহরে আশ্রয় নেওয়ার জন্য খবর পাঠান। এরপর সা'দ ইয়াজদেগার্ডকে পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য কয়েকটি সেনাদল প্রেরণ করেন। এই সেনাদলগুলো ইয়াজদেগার্ডের কিছু সৈন্যকে ধরে ফেলে, তাদের হত্যা করে এবং 'খোসরো'-এর অলঙ্কার ও মুকুটের একটি অংশ উদ্ধার করে। মুসলিমরা মাদায়েন থেকে প্রচুর সম্পদ এবং 'খোসরো'র ধন-সম্পদের একটি বড় অংশ লাভ করে। সা'দ পঞ্চম ভাগটি মদিনায় উমারের কাছে পাঠান এবং সালমান ফারসি মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে অবশিষ্ট অংশ বণ্টনের তত্ত্বাবধান করেন। যখন গণীমতের পঞ্চম ভাগটি মদিনায় পৌঁছায়, তখন উমার খোসরোর স্বর্ণের বালাগুলো সুরাকা ইবনে মালিক মুদলাজিকে দিয়ে দেন। এর মাধ্যমে তিনি নবী ﷺ-এর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন, যা তিনি সুরাকাকে দিয়েছিলেন, যখন সুরাকা মদিনায় হিজরতের সময় নবী ﷺ–এর পথ আটকিয়েছিল।

মাদায়েন বিজয়ের পর ইয়াজদেগার্ড হুলওয়ানে পালিয়ে যান এবং 'মিহরান রাজি'কে একটি পারস্য সেনাবাহিনীসহ 'জালুলা'য় পাঠান। সা'দ হাশিম ইবনে উতবাহকে বারো হাজার সৈন্যসহ জালুলায় প্রেরণ করেন এবং ১৬ হিজরির যুল-ক্বাদ মাসে জালুলা বিজিত হয়। এরপর হাশিম আল-কা'কা' ইবনে আমর তামিমিকে তাদের অবশিষ্ট সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করার আদেশ দেন। তিনি 'খানিকিন' নামক স্থানে মিহরানের নাগাল পেয়ে তাকে হত্যা করেন এবং কা'কা' হুলওয়ানের দিকে অগ্রসর হন। তিনি দেখতে পান যে, আক্রমণের খবর পেয়ে ইয়াজদেগার্ড পাহাড়ে পালিয়ে গেছেন এবং হুলওয়ানে খুসরাউ শানুমের নেতৃত্বে অশ্বারোহী সৈন্য রেখে গেছেন। কা'কা' তাদের পরাজিত করে হুলওয়ানে প্রবেশ করেন। এর মাধ্যমেই মুসলিমদের হাতে মাদায়েন, জালুলা ও হুলাওয়ান বিজয় সম্পন্ন হয়। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

সূচিপত্র

ইসলামী দাওয়াহর রূপরেখা, গুরুত্ব ও ফযীলত

ড. রেজাউল করিম মাদানী ❖
পি এইচ ডি, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(পর্ব-৩য়)

সাহাবাদের দাওয়াত ও আমল :

মু'আয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবু মুসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করলেন : "তুমি কীভাবে কুরআন পড়ো? তিনি বললেন : "আমি তা পড়ি সালাতে, ভ্রমণে, দাঁড়িয়ে, বসে, শোয়া অবস্থায় এবং আমি তা অংশে অংশে (অর্থাৎ অল্প অল্প করে, ধীরে ধীরে) পড়ি। তখন মু'আয বললেন : "কিন্তু আমি ঘুমাই, তারপর উঠে পড়ি এবং আমি আমার ঘুমকেও সওয়াবের আশায় গণনা করি, যেমন আমি আমার কিয়ামকে সওয়াবের আশায় গণনা করি।"[৩৭]

متفق عليه: [البخاري، واللفظ له: كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع.

সালফে সালিহীনদের কাছ থেকে কুরআনের ফযিলত, এর প্রতি যত্নশীল হওয়া ও এর ওপর আমল করার ব্যাপারে বহু বাণী বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে : সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : "আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই! কুরআনের এমন কোনো সূরা নাযিল হয়নি যা আমি জানি না কোথায় নাযিল হয়েছে, আর কুরআনের এমন কোনো আয়াত নাযিল হয়নি যা আমি জানি না কোন ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আর যদি আমি কারও কথা শুনতাম যে, সে আমার চেয়ে বেশি কুরআন জানে এবং উটে চড়ে তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব, তবে আমি অবশ্যই তার কাছে যেতাম।[৩৮]

صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي - فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم .

তিনি আরো বলেছেন : "কুরআন পাঠকের উচিত, রাতে যখন মানুষ ঘুমায়, তখন তার রাতের কিয়াম দ্বারা পরিচিত হওয়া, দিনে যখন মানুষ খাবার খায় করে, তখন তার সিয়াম দ্বারা পরিচিত হওয়া, যখন মানুষ হাসে, তখন তার কান্নার মাধ্যমে পরিচিত হওয়া, যখন মানুষ মিশ্রিত হয়, তখন তার তাক্বওয়া দ্বারা পরিচিত হওয়া, যখন মানুষ অযথা কথা বলে, তখন তার নীরবতা দ্বারা পরিচিত হওয়া, যখন মানুষ অহঙ্কার করে, তখন তার বিনয় দ্বারা পরিচিত হওয়া এবং যখন মানুষ আনন্দে থাকে, তখন তার হৃদয়ের দুঃখ দ্বারা পরিচিত হওয়া।[৩৯]

কাতাদাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই আয়াতের ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا﴾ তাফসীরে বলেছেন : "হাবলুল্লাহ (আল্লাহর রশি), যার সাথে আঁকড়ে ধরতে আদেশ দেওয়া হয়েছে– সেটি হলো কুরআন।[৪০]

ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : "আল্লাহ আমাদের ওপর তাঁর কিতাব ও নবীর সুন্নাহ আঁকড়ে ধরাকে ও তাতে ফিরে যাওয়াকে ওয়াজিব করেছেন। মতভেদের সময় আমাদের কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বলেছেন। আর আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্ক রাখার আদেশ দিয়েছেন, বিশ্বাস ও আমলের দিক থেকে। এটিই হলো একতার মাধ্যম, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থা গুটিয়ে নেওয়ার পথ, যার মাধ্যমে দুনিয়া ও

❖ প্রভাষক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি বাংলাদেশ।

[৩৭] ورواه مسلم- كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما (ح ৪৭১৬)(৪/ ১৯১২) (ح ২৪৬৩) (৪/১৯১৩).

[৩৮] (برقم ৪০৮৬)(৪/১৫৭৮)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التعسير، (برقم ১৭৩৩].

[৩৯] رواه ابن أبي شيبة في المصنف ،(৮/ ২৩১ (ح :২৪৬৩). ﷺ رقم:৩৫৫৮৪ -،(৪/১৯১২ ح:৪৭১৬) ومسلم: كتاب

[৪০] ৯.(২৭২/২১)التمهيد لابن عبد البر

দ্বীনের মঙ্গল সাধিত হয় এবং মতভেদের অমঙ্গল থেকে মুক্তি মেলে।”

সালফে সালিহীন (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন) কুরআনুল কারীমের প্রতি অসাধারণ যত্নশীল ছিলেন। তারা কুরআনকে সংগ্রহ করেছেন এবং তা বুক ও কাগজে সংরক্ষণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই ছিলেন প্রথম হাফিজ ও ক্বারী, যাঁর ওপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে কুরআন নাযিল হয়েছিল।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী গ্রহণকালে কষ্ট অনুভব করতেন, তিনি তাঁর ঠোঁট নাড়াতে থাকতেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾

অর্থাৎ: “তুমি কুরআনকে তাড়াহুড়ো করে পড়ার জন্য জিহ্বা নাড়িও না। একে তোমার বুকে সংরক্ষণ করা এবং তা ক্বিরাআত করানো আমাদের দায়িত্ব। অতঃপর যখন আমরা তা পাঠ করব, তখন তুমি তার ক্বিরাআত অনুসরণ করো। তারপর নিশ্চয়ই এর ব্যাখ্যা আমাদের দায়িত্ব।[৪১]

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : এর অর্থ হলো, আল্লাহ কুরআনকে তাঁর বুকে সংগ্রহ করবেন, এরপর তিনি তা পাঠ করবেন। আর যখন জিবরীল তাঁর কাছে আসতেন, তখন রাসূল ﷺ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। পরে জিবরীল চলে গেলে তিনি তা তাঁর মতো করেই পড়তেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “জিবরীল প্রতি বছর আমার সাথে কুরআন একবার করে পাঠ করতেন। এ বছর তিনি আমার সাথে দুইবার মুরাজা‘আ করেছেন। আমি মনে করি, এর দ্বারা আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে।

তাবেয়ী ও পরবর্তী প্রজন্ম :

তাবেয়ী ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মও কুরআনের প্রতি গভীর যত্নশীল ছিলেন। তারা রাত-দিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদেরও কুরআন পাঠ ও তার ওপর আমল করার নির্দেশ দিতেন। বিশেষত রমাযান মাসে তারা অন্য সব কিছুর তুলনায় কুরআনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। এটা প্রমাণ করে যে, তাদের কাছে কুরআনই ছিল সব কাজের প্রধান ও মূল উৎস। আর যখন সাধারণ বিষয়গুলোতেই কুরআন তাদের প্রথম উৎস ছিল, তখন ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে তো এর মর্যাদা আরো বেশি– কারণ কুরআনই দাওয়াতের মূল ভিত্তি। অতএব আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে মাসউদ) রমাযানে তিন দিনে কুরআন খতম করতেন।

আসওয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রমাযান মাসে দুই রাতে কুরআন খতম করতেন এবং মাগরিব ও এশার মাঝখানে ঘুমাতেন।

ইবরাহিম নাখায়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন : “আসওয়াদ রমাযান মাসে প্রতি দুই রাতে কুরআন খতম করতেন।”

সুতরাং সালফে সালেহীন (আল্লাহ তাঁদের রহম করুন) কুরআনের সাথে এই রকম আচরণ করতেন, আর রমাযান হলো কুরআন নাযিলের মাস, যেখানে জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কুরআন শোনাশুনি করতেন, আর এ সময় হলো সর্বোত্তম সময়, যেখানে সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন :

“তোমরা কুরআন শিক্ষা করো। নিশ্চয় কুরআনের প্রতিটি হরফের জন্য দশটি সওয়াব লেখা হয় এবং এর দ্বারা দশটি গুনাহ মাফ করা হয়। তবে আমি ‘আলিফ-লাম-মীম’ বলি না, বরং আলিফের জন্য দশ, লামের জন্য দশ, আর মীমের জন্য দশ।

[৪১] সূরা কিয়ামা আয়াত : ১৬-১৯।

হাদিসে কুরআনের ফযিলত :

কুরআনের ফযিলত ও এর তেলাওয়াত, গবেষণা, শিক্ষা এবং শেখানোর প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»:

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।[৪২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

«من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف»

"যে আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর পাঠ করে, তার জন্য একটি নেকি রয়েছে, আর একটি নেকি দশগুণ বৃদ্ধি পায়। আমি বলি না যে আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর; বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর, এবং মীম একটি অক্ষর।[৪৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে কুরআন ভুলে যাওয়া থেকে কঠোরভাবে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন : "তোমরা কুরআনকে নিয়মিতভাবে পড়তে থাকো, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কুরআন বেঁধে রাখা উট থেকে মুক্ত হওয়ার চেয়েও দ্রুত মানুষের বুক থেকে বেরিয়ে যায়।[৪৪]

কুরআনের প্রতি সাহাবাদের যত্ন ও গুরুত্বারোপ :

সাহাবাগণ কুরআন হিফজ ও তিলাওয়াতে প্রতিযোগিতা করতেন এবং এ ব্যাপারে তাদের মাঝে প্রবল প্রতিযোগিতা দেখা যেত। চার খলিফাসহ আরো অনেকে পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। বিশেষ করে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুরআনকে সংগ্রহ করে কাগজে লিখিয়েছিলেন। তাঁর খেলাফতের আমলে ইয়ামামার যুদ্ধে বহু ক্বারী ও হাফেজ সাহাবি শহীদ হওয়ার পর আশঙ্কা হয়েছিল যে, হাফেজগণ শহীদ হলে কুরআনের কিছু অংশ হারিয়ে যেতে পারে। তখন তিনি কুরআনকে একত্র করে এক মুসহাফে সংরক্ষণ করান। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবাগণ কুরআন পাঠ ও গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। নবী ﷺ বলেছেন : "আমি রাতের বেলা আশ'আরীয়দের কুরআন পড়তে শুনে তাদের আওয়াজ শুনে তাদের ঘরবাড়ি চিনে ফেলি এবং তাদের ঘরবাড়িও তাদের কুরআন পাঠের আওয়াজ দ্বারা চিনে ফেলি, যদিও দিনে তাদের বসতি আমি দেখি না।"

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন :

«والله الذي لا إله غيرهما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه»

"আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত আর কোনো সত্য উপাস্য নেই! কুরআনের এমন কোনো সূরা নাযিল হয়নি, যা আমি জানি না কোথায় নাযিল হয়েছে। আর কুরআনের এমন কোনো আয়াত নাযিল হয়নি, যা আমি জানি না কোন ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আর যদি আমি এমন কাউকে জানতাম, যে আমার চেয়ে বেশি কুরআন জানে এবং তার কাছে পৌঁছাতে উটে চড়ে সম্ভব, তবে আমি অবশ্যই তার কাছে যেতাম।

رواه البخاري- كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي - ﷺ -

তবে আল্লাহ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি আমরা দ্বীনের দিকে ফিরে আসি তবে তিনি শাস্তি দূর করবেন, বিজয়, সাহায্য ও প্রতিষ্ঠা দান করবেন। যেমন তিনি বলেছেন : নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসূলদের ও মুমিনদের দুনিয়াতে এবং সেদিন সাহায্য করব যেদিন সাক্ষ্যদাতারা দাঁড়াবে...[৪৫] (চলবে ইনশাআল্লাহ)

---

[৪২] صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه, (8/১৯১৯ ح:৪৭৩৯)

[৪৩] الترمذي , كتاب فضائل القرآن عن رسول الله ﷺ ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر, (৫/ ১৭৫ ح: ২৯১০).

[৪৪] صحيح البخاري , كتاب فضائل القرآن باب استذكار القرآن وتعاهـده (8/ ১৯২১ ح: ৪৭৪৬). مسلم ،كتاب صلاة المسافرين وقصرها ح: ৭৯১).

[৪৫] سورة الحج, الآية: (৪০-৪১)

মুদ্রা ব্যবসায়-এর বিধান

মুফতী শাইখ মো: আব্দুর রউফ বিন আইয়ুব আলী মাদানী❖

মানুষ ইতিহাসের ঊষালগ্ন থেকেই মুদ্রা ব্যবহার করত। প্রথমে মানুষ পণ্য দ্বারা পণ্য আদান প্রদান করত। এটাকে বলা হত মুকায়াযা (مقايضة)। কিন্তু এটাতে নানা অসুবিধার কারণে মানুষ পণ্য মুদ্রার ব্যবহার শুরু করে। সমুদ্রের উপকূলের অধিবাসীরা মাছকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মরুভূমি ও চারণক্ষেতের অধিবাসীরা বিভিন্ন জন্তু ও চামড়াকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে। কোনো কোনো জাতি কাপড় ও অস্ত্রকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে। মধ্য আফ্রিকাতে পুঁতিকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের উপদ্বীপের অধিবাসীরা পাখির রঙ্গিন পালককে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই জার্মানি সিগারেটকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তারপরে আসল ধাতব মুদ্রা। মানুষ তামা, ব্রোঞ্জ ব্যবহার শুরু করে। তারপর তারা স্বর্ণ ও রৌপ্যকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের দিশা পায়। কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্যের দাম বেশি হওয়াই মানুষ কম মূল্যের ধাতু থেকে ফুলূস বা পয়সাকে মুদ্রা হিসেবে গ্রহণ করে যেমন: কিরাত ও দানেক।[৪৬] রাসূল ﷺ-এর সময়ে দিনার-দিরহামের প্রচলন ছিল। দিনার ছিল স্বর্ণের এবং দিরহাম ছিল রৌপ্যের। আরবের লোকেরা প্রাক-ইসলামী যুগে এবং ইসলামের সূচনাতে রোম ও পারস্যের মুদ্রা ব্যবহার করত। রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস-এর দিনার ও পারস্যের দিরহাম বাগলী আরব মুলুকে আসত।[৪৭] রসূল ﷺ এর ওফাতের পরেও দীর্ঘদিন ধরে সাহাবীগণ রোম-পারস্যের দিনার ও দিরহাম ব্যবহার করতেন। এরপর ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তার যুগে প্রচলিত সেই মুদ্রার ওপর কিছু ইসলামি নকশা অঙ্কন করেছিলেন। কিছু মুদ্রার ওপর তিনি অঙ্কন করেন “আল হামদু লিল্লাহ” কিছু মুদ্রার ওপর “মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ” এবং তিনি রোম পারস্যের দিনার ও দিরহামের আদলে ফুলূস বা ধাতব মুদ্রা বের করেন এবং তার ওপর নিজের নাম লিখে দেন। ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সময়ে মুদ্রার ওপর অঙ্কন করা হয় “আল্লাহু আকবার”।[৪৮] অতঃপর ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম দিনার-দিরহাম প্রণয়ন করেন আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান ৭৬ হিজরী সনে।[৪৯] আর বর্তমানে মুদ্রা বলতে বোঝায় কাগজী মুদ্রা। ইস্যুকারী দেশ অনুযায়ী কাগজী মুদ্রা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, যেমন : টাকা, রিয়াল, ডলার, ইউরো ইত্যাদি। হাদীসে স্বর্ণমুদ্রা তথা দিনার-দিরহাম লেনদেনের বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে, কিন্তু কাগজী মুদ্রা যেহেতু পরবর্তীতে উদ্ভব হয়েছে তাই সে বিষয়ে আলেমদের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক মত হলো, স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুদ্রা ও অন্যান্য মুদ্রার ন্যায়, কাগজী মুদ্রাও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বিকল্প মুদ্রা, এর মধ্যে মূল্যমান আছে এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিভিন্ন বিধান এখানে জারি হবে। যেমন: এখানে উভয় প্রকার রিবা বুয়ূ জারি হবে, ফলে এক জাতীয় মুদ্রা কম-বেশি করে লেনদেন করা বৈধ হবে না, লেনদেনের সময় কোনোটিকে বাকি রাখা যাবে না বরং একই মজলিসে হাতে হাতে হতে হবে, এটাকে বাইয়ে সালামে মূলধন বানানো যাবে এবং নিসাব পরিমাণ হলে এটাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।[৫০] নিচে আমরা কয়েকটি পয়েন্টে মুদ্রা ব্যবসায়-এর কিছু বিধান তুলে ধরার প্রয়াস পাবো ইন শা আল্লাহ।

প্রথম পয়েন্ট : সমজাতীয় মুদ্রা যেমন : টাকার বিনিময়ে টাকা কম-বেশি করে ও বাকিতে লেনদেনের বিধান :

প্রথমত : টাকার বিনিময়ে টাকা কম-বেশি করে বিক্রয়ের বিধান :

মাসআলাটির স্বরূপ : ঈদে বাচ্চদের ঈদ বোনাস বা হাদিয়া দেওয়ার জন্য নতুন দশ টাকার নোট অথবা

❖ উস্তাযুল ফিকহ ওয়াল হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

[৪৬] আল মুআমালাত আল মালিয়া আল মুআছিরা ফিল ফিকহিল ইসলামী, ড. উছমান শিব্বির, পৃ. (১৫০-১৫৩)।

[৪৭] ফুতুহুল বুলদান, লিল বালাযুরী, পৃ. (৪৫২)।

[৪৮] তা'রীবুন নুকুদ ওয়াদ দাওয়াবীন, লি হাসান আল হাল্লাক, পৃ. (২২)। ফিকহুল মুআমালাত আল মালিয়া আল মুআছিরা, ড. খাছলান, পৃ. (৬২)।

[৪৯] আন নুকুদ আল ইসলামিয়া লিল মাকরীযী, পৃ. (১০)।

[৫০] আন নুকুদ, অযা-ইফুহাল আছাছিয়া ওয়া আহকামুহাশ শারইয়্যা, পৃ. ৩৭৫; আল মুআমালাত আল মালিয়া আল মুআছিরা ফিল ফিকহিল ইসলামী, ড. উছমান শিব্বির, পৃ. (১৬৪-১৬৫); আত তাযাখ্খুম আন নাকদি ফিল ফিকহিল ইসলামী, (১/৪৯)।

সূচিপত্র

নতুন বিশ টাকার নোট অথবা নতুন পঞ্চাশ-একশত টাকার নোট ইত্যাদি পুরাতন টাকা বেশি দিয়ে ক্রয় করা। অথবা কাটা- ছেঁড়া অচল টাকা দিয়ে সচল টাকা কম-বেশি করে ক্রয় করা, যেমন এক হাজার টাকা পরিমাণ কাটা-ছেঁড়া নোট দিয়ে উদাহরণ স্বরূপ সাতশত টাকা ভালো ও সচল নোট ক্রয় করা।

মাসআলাটির বিধান : অত্র মাসআলাটির হুকুম হলো, যদি টাকা সচল থাকে অর্থাৎ এতটা কাটা-ছেঁড়া নয় যে, তা বাজারে চলে না বরং বাজারে তা সচল এবং লোকেরা তা গ্রহণ করে, তাহলে এমন টাকা ক্রয় বিক্রয় বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো তা হাতে হাতে অর্থাৎ নগদে হতে হবে এবং সমান সমান হতে হবে। যদি কম-বেশি করা হয় কিংবা বাকিতে করা হয় তাহলে তা হারাম ও সুদ হবে। কারণ কাগজী মুদ্রা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত। আর স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রা স্বজাতের সাথে বিনিময়ের ক্ষেত্রে শর্ত হলো তা সমান সমান হতে হবে। অতএব কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রেও একজাতীয় মুদ্রার বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমান সমান হতে হবে।

রাজকীয় সউদী আরবের হাইয়াতু কিবারিল উলামা সিদ্ধান্ত প্রদান করেছে যে :

“কাগজী মুদ্রা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি মুদ্রা যা স্বর্ণ মুদ্রা ও রৌপ্য মুদ্রা ও অন্যান্য মুদ্রার ন্যায়। এবং এটা ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের বিভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন জাতের হিসেবে বিবেচিত হবে অর্থাৎ সৌদি কাগজী মুদ্রা (রিয়াল) এক জাতের, আমেরিকান কাগজী মুদ্রা (ডলার) এক জাতের, এভাবে প্রত্যেকটি কাগজী মুদ্রা আলাদা স্বয়ংসম্পূর্ণ জাত হিসেবে বিবেচিত। আর তাই কাগজী মুদ্রাতে উভয় প্রকার সুদ জারি হবে যেমনভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাতে ও অন্যান্য মুদ্রা যেমন ফুলূস বা ধাতব মুদ্রায় সুদ জারি হয়।[৫১]

সৌদি আরবের লাজনাহ দায়েমার ফাতাওয়াতে এসেছে:

إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو في إحداهما شرعا،

‘যখন একজাতীয় দুটি মুদ্রার মাঝে পরস্পর লেনদেন করা হবে তখন উভয়ের মাঝে সমান সমান হওয়া আবশ্যক এবং কম-বেশি করা হারাম। আর উভয় মুদ্রা বা কোনো একটি বিলম্বে গ্রহণ করা শরী‘আতের দৃষ্টিতে হারাম।’[৫২]

মক্কা মুকার্‌রমাস্থ আল মাজমা আল ফিকহীতে এ ব্যাপারে এসেছে :

لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالاً سعودية ورقاً، نسيئة أو يداً بيد .

একজাতীয় কাগজী মুদ্রা পরস্পর কম-বেশি করে বিক্রয় করা যাবে না, সেটা নগদে হোক আর বাকিতে হোক। অতএব সৌদি এগার রিয়ালের বিনিময়ে দশ রিয়াল বিক্রয় করা যাবে না বাকিতে হোক বা নগদে।[৫৩]

তবে যদি কাটা-ছেড়ার কারণে টাকা অচল হয়ে যায় এবং লোকেরা তা গ্রহণ না করে, তাহলে সেটা দিয়ে সচল টাকা কম-বেশি করে বিনিময় করা যাবে কিনা সে বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিছু আলেম এটাকে বৈধ বলেছেন অর্থাৎ ১০০ টাকার ছেঁড়া অচল নোট দিয়ে ৫০ টাকার ভালো নোট বিনিময় করা যাবে।

ফাযীলাতুল শাইখ আব্দুর রহমান আল বার্‌রাক বলেন : “স্বর্ণ দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা রৌপ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো উভয়টা সমান হতে হবে। এ ক্ষেত্রে ভালো খারাপের মাঝে এবং ভাঙা ও ভালোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। আর বর্তমানে বিভিন্ন জিনিসের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাগজী মুদ্রাটা স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু কাগজী মুদ্রার ওপর স্বর্ণ ও রৌপ্যের সকল বিধান প্রয়োগ করা সম্ভব না। কারণ কাগজী মুদ্রার নিজস্ব কোনো মূল্য নেই, বরং রাষ্ট্রের স্বীকৃতির মাধ্যমে কাগজী মুদ্রা তার মূল্য অর্জন করে। আর এ কারণে আমি মনে করি, কাটা-ছেঁড়া অচল

[৫১] আবহাছ হাইয়াতি কিবারিল উলামা ফিল মামলাকাতিল আরাবিয়াতিস সাউদিয়া, ১/৫৭-৫৮)।

[৫২] ফাতাওয়া আল লাজনাহ আদ দায়েমাহ, আল মাজমুআহ আল উলা, (১৩/৪৪৪)।

[৫৩] মাজাল্লাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, করার নং (৬), দাওরা নং (৫), (৩/৯৫২)।

টাকাকে তার অর্ধেক দামে বিনিময় করাতে কোনো সমস্যা নেই; কারণ এ মুদ্রা ছিঁড়ে যাওয়ায় এখন তার মূল্য হারিয়েছে।”[৫৪]

আবার কিছু আলেম বলেছেন যে, কাটা-ছেঁড়া অচল নোট যা বিনিময়যোগ্য তা কম মূল্যে সচল নোটের সাথে বিনিময় করা যাবে না বরং তা সুদ হবে। তাই ১০০ টাকার কাটা ছেঁড়া অচল নোট দিয়ে ৫০ টাকার ভালো নোট বিনিময় করা বৈধ নয়। এই ফাতাওয়া দিয়েছেন ফাযীলাতুশ ড. রাশেদ বিন সা'দ আল মুতাউওয়া।[৫৫]

আমার দৃষ্টিতে এই মতটিই সঠিক; কারণ কাটা-ছেঁড়া টাকা বাজারে অচল হলেও যেহেতু সেটা বিনিময়যোগ্য অর্থাৎ সেটা দিয়ে ভালো টাকা গ্রহণ করা সম্ভব, তাই সেটা মূল্যহীন নয় বরং এই ছেঁড়া টাকা কম দামে কিনে ক্রেতারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট সমান দামে বিক্রয় করে। আর কাগজী মুদ্রার মূল্য যেহেতু রাষ্ট্রের স্বীকৃতির ওপর, আর রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেহেতু কাটা-ছেঁড়া টাকাকে সমান মূলই দিয়ে থাকে তাই সেটা নিজের মূল্য হারায়নি বরং এটা প্রমাণ করে তার মূল্য আছে। অতএব কাটা-ছেঁড়া টাকা কম মূল্যে বিক্রয় করা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ একজাতীয় মুদ্রা কম-বেশি করে বিক্রয় করা সুদ। এজন্য যারা বিভিন্ন স্থানে কম টাকায় কাটা-ছেঁড়া টাকা ক্রয় করে তাদের কাছে গায়ের দামের চেয়ে কম দামে কাটা-ছেঁড়া টাকা বিক্রয় করা বৈধ নয়। ছেঁড়া টাকা সঠিকভাবে বিনিময়ের জন্য আমরা দুটি পন্থা অবলম্বন করতে পারি, যথা:-

এক) আমরা সরাসরি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট থেকে সমান দামে ছেঁড়া টাকা দিয়ে ভালো টাকা বিনিময় করতে পারি। যদি এটা অসম্ভব হয় বা কষ্টসাধ্য হয় তাহলে আমরা নিচে বর্ণিত দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করতে পারি।

দুই) আমরা বাজারের ছেঁড়া নোট ক্রয়কারীদের কাছে গায়ের দামে ছেঁড়া নোট বিক্রয় করে অর্থাৎ ১০০ টাকার ছেঁড়া নোট দিয়ে ১০০ টাকার ভালো নোট ক্রয় করব এবং তাকে তার কাজের ও সময়ের জন্য সম্মতির ভিত্তিতে পারিশ্রমিক প্রদান করব। অথবা ছেঁড়া নোটের মালিকরা বাজারের ছেঁড়া নোট ক্রয়কারীদের নিকট বিক্রয় না করে তাদেরকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওয়াকীল নিযুক্ত করবে যাতে তারা মালিকদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক থেকে ছেঁড়া টাকা সমান দামে বিনিময় করে আনে। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

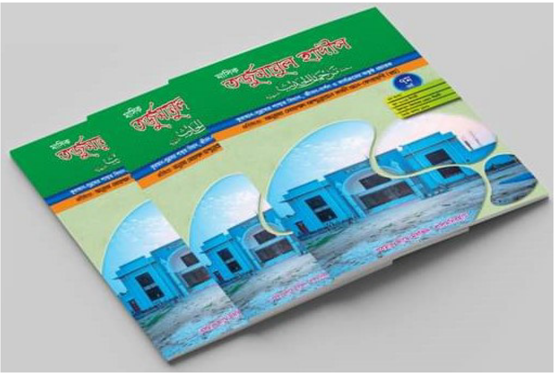

গ্রাহক হওয়ার আহ্বান

“মাসিক তর্জুমানুল হাদীস”

প্রত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট হতে আগ্রহীদের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা গ্রাহক ফি ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রেরণসহ। যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

যোগাযোগ:

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮
বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

ফেসবুক পেইজ
https://www.facebook.com/tarjumanulhadeeth/

ওয়েবসাইট
http://www.jamiyat.org.bd/

[৫৪] Islamqa.info অনলাইন ওয়েব সাইট, আল ফিকহ, মুআমালাত, হুকমু ইসতিবদালিল আওরাক আন নাকদিয়া আল মুমায্যিকাহ, ফাতাওয়া নং (৪৬৮৩৬)।

[৫৫] ইউটিউব আলোচনা : https://share.google/6muHS1NfHZSYXWNhG

কুরআনবাদের স্বরূপ সন্ধান ও সংশয় নিরসন

শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক্ব [❊]

১২ তম পর্ব

কুরআনবাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস : ইতঃপূর্বের আলোচনাতে কুরআনবাদের পরিচয়, উৎপত্তি ও তাদের বিস্তার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি, যদিও তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস পূর্বোল্লেখিত আলোচনায় তাদের নেতাদের পরিচয় উল্লেখের মাধ্যমে কিছুটা আলোচিত হয়েছে। একথা স্পষ্ট যে, কুরআনবাদের অনুসারীদের নিজস্ব কোনো চিন্তাধারা নেই, কারণ তাদের মস্তিষ্ক পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের কাছে বিকৃত আছে নয়তো বা বন্ধক দেওয়া হয়েছে। কাজেই কুরআনবাদী মতবাদের যারা নেতৃত্ব দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে তাদের নিজস্ব কোনো চিন্তা চেতনা নেই। তারা যেহেতু প্রাচ্যবিদদের অনুগত দাস বিধায় প্রাচ্যবিদদের চিন্তাধারা ও কুরআনবাদের চিন্তাধারাতে কোনো তফাৎ নেই। প্রাচ্যবিদরা যেহতু মুসলিমদেরকে মূলধারার ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতেই প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে পা রেখেছে সেহেতু তাদের চিন্তাধারা ইসলাম ও মুসলিম কেন্দ্রিক হবে এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং তাদের ছাত্র ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাস নামক কুরআনবাদের নেতা বলে পরিচিত (যাদের প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম ও পরিচয় পূর্ববর্তী আলোচনাতে উল্লেখ করেছি) এবং তাদের খুদ-গুঁড়া ভোগী অর্বাচীনদের কাছে তাদের চিন্তাধারা যে বিশ্বাসে পরিণত হবে এতে তো আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে বলে মনে হওয়ার কথা নয়। নিম্নে তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাস তুলে ধরা হলো।

এক. শুধমাত্র কুরআনুল কারীমের ওপর নির্ভর করার প্রতি আহ্বান করা।

শুধুমাত্র কুরআনের ওপর নির্ভর করা ও সুন্নাহ বা হাদীস অস্বীকার করার প্রতি মানুষকে আহ্বান করাই তাদের দাওয়াতের মূল এজেন্ডা এবং তাদের চিন্তার জগতের মূলভিত্তি। তারা চায় যাতে মানুষ শরীয়তের আমল থেকে বিচ্যুত হয়, আর এ বিচ্যুতি হবে তাদের জন্য বড় সফলতার কারণ। তাদের বক্তব্য হলো শরীয়তের জন্য একমাত্র কুরআনই যথেষ্ট। এর দ্বারা তারা বুঝাতে চায় যে, ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ কুরআনেই রয়েছে, বিধায় কুরআনের সাথে দ্বীনের মূলনীতি হিসাবে হাদীস মান্য করা যাবে না। এমন চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা যেমন শরীয়তের আমল পরিত্যাগ করেছে টিক তেমনই মানুষকেও শরীয়ত পরিত্যাগ করার প্রতি আহ্বান করছে। তাদের এ দাবি এতই জঘণ্য যে, তা শয়তানের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ কুরআনুল কারীম ইসলামী শরীয়তের জন্য একটি সার্বজনীন মৌলিক নীতমালা বা শরীয়তের সকল বিষয়ের সূত্র। আর এ নীতিমালাগুলোকে শরীয়তের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বাস্তবায়ন করতে সুন্নাহ দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা অপরিহার্য।

আবু ইসহাক আশ্-শাত্বিবী (রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি) বলেন :

الِاقْتِصَارَ عَلَى الْكِتَابِ رَأْيُ قَوْمٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ، خَارِجِينَ عَنِ السُّنَّةِ؛ إِذْ عَوَّلُوا عَلَى مَا بَنَيْتَ عَلَيْهِ من أن الكتاب فيه بيان كل شئ، فَاطَّرَحُوا أَحْكَامَ السُّنَّةِ فَأَدَّاهُمْ ذَلِكَ إِلَى الِانْخِلَاعِ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ.

নিশ্চয় শুধু কুরআনের ওপর স্বীমাবদ্ধ থাকা- এটা এমন একটা সম্প্রদায়ের মতামত যাদের শরীয়তে কোনো অংশ নেই, তারা সুন্নাহ থেকে বহির্ভূত। কারণ তারা প্রলাপ বকে যে, ইসলামের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কুরআনের ওপরই নির্ভর করতে হবে, কারণ তাতে সবকিছুর বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর তারা হাদীসের বিধানাবলীকে ছুঁড়ে ফেলেছে। আর এর মাধ্যমে তারা জামা'আত তথা মুসলিম মিল্লাত থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং কুরআনুল কারীমের মর্ম অনুধাবন থেকে বিচ্যুত হয়েছে।[৫৬]

❊ মুদাররিস, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা ও পাঠাগার সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর।

[৫৬] আল মুয়াফাক্বাতু লিশ শাত্বিবী : ৪/৩২৫,৩২৬পৃ.।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইসলামী শরীয়তের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কুরআনের ওপর সীমাবদ্ধ থাকার আহবান করা তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা। তাদের মূল লক্ষ্য কুরআনের দাওয়াহ নয় বরং প্রাচ্যবাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। তারা কুরআনকে সম্মান করে না বরং তাদের মনগড়া মতবাদের স্বার্থে কুরআনুল কারীমকে নগ্নভাবে ব্যবহার করে থাকে।

দুই. সুন্নাহ বা হাদীস অস্বীকার করার প্রতি আহবান।

তাদের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের অণ্যতম হলো নাবাবী সুন্নাহ বা হাদীস অস্বীকার করার প্রতি মানুষদেরকে আহব্বান করা। তাদের দাওয়াতি কাজের মূল লক্ষ্যই হলো হাদীস অস্বীকার করা এবং মুসলিম জাতিকে হাদীসবিমূখ করা। তারা মনে করে যে, হাদীস কোনোভাবেই দ্বীনের বিষয় নয় এবং প্রচলিত হাদীসগুলোকে আল্লাহর দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না।[৫৭]

তাদের কেউ কেউ এমন দাবি করে যে, রাসূলের মুখনিঃসৃত কথা এবং অন্যাণ্য মানুষদের কথার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।[৫৮]

তাদের বক্তব্য হলো প্রচলিত যে হাদীস ভাণ্ডার আছে এগুলোকে নাবী ﷺ-এর দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না, কারণ এগুলো রাসূল পরবর্তী সময়ে বানিয়ে রাসূলের নামে যুক্ত করা হয়েছে।[৫৯] (আউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

এ ছাড়া তাদের হাদীস অস্বীকারের ওপর আরো অনেক লেখনী রয়েছে, যেখানে ইসলামে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা, হাদীসকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। যার ফলে কুরআনবাদীরা কুরআনের নির্দেশকেই অমান্য করেছে, কারণ রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মান্য করার আদেশ কুরআনুল কারীমের অনেক আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا রাসূল ﷺ তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা তোমরা বর্জন কর।[৬০]

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।[৬১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ﴾

বল, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা বিমূখ হও তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অস্বীকারকারীদের ভালবাসেন না।[৬২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন :

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾

যে রাসূলের অনুসরণ করল সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর কেউ যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় জোরপূর্বক তাকে সৎ পথে আনার জন্য আমরা তোমাকে পাহাদার করে পাঠাইনি।[৬৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

আল্লাহ এবং তার রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও কোনো মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোনো অধিকার রাখে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ঠ হল।[৬৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

[৫৭] আল কুরআন ওয়া কাফা : ৪০পৃ.।
[৫৮] আল ইসলামু ওয়াল হুর্রিয়া ওয়াল ইলমিয়্যাহ (জামাল বান্না) : ১৫পৃ.
[৫৯] আল কুরআনিয়্যুনা ল আরাব : ২০১পৃ.
[৬০] সূরা আল হাশর আয়াত : ৭।
[৬১] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ১৩২।
[৬২] সূরা আলে-ইমরান আয়াত : ৩১।
[৬৩] সূরা আন-নিসা আয়াত : ৮০।
[৬৪] সূরা আল-আহযাব আয়াত : ৩৬।

তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় থাকবে না এবং তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে।[৬৫]

সুতরাং হাদীস অস্বীকার করা আর হলো কুরআনের নির্দেশ অস্বীকার করার। আর কুরআনের নির্দেশ অমান্য করে নিজেকে আহলে কুরআন দাবি করা সুস্পষ্ট গোমরাহী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

তিন. কুরআন ও সুন্নাহর ওপর যুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া

কুরআনবাদীরা কুরআন ও সুন্নাহর ওপর যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এমনকি যুক্তিকে তারা সবকিছু থেকে পবিত্র মনে করে থাকে। এমনকি কুরআনবাদের এমন অনেক নেতা রয়েছে যারা তাদের যুক্তিকে টেকানোর জন্য কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সূরা পর্যন্তও অস্বীকার করেছে। প্রকৃতপক্ষে সুস্থ আক্বল কিংবা যুক্তি কখনোই কুরআন সুন্নাহবিরোধী হয় না।

কারণ আক্বল বা বিবেক দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহ হতে বিভিন্ন শারঈ বিধিবিধান নির্গত করা হয় এবং শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় আক্বল দিয়েই অনুধাবন করতে হয়। আর আক্বলের ভিত্তিতেই শারঈ আমলগুলো বাস্তবায়ন করতে হয়। সুতরাং আক্বল বা বিবেক কখনোই কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী হতে পারে না।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ) বলেন : আক্বল হলো আত্মার স্বরূপ এবং তার শক্তি চোখের দৃষ্টির মতো। তাতে ঈমান ও কুরআনের নূর যুক্ত হলে তা চোখে সূর্য ও আগুনের আলো পতিত হওয়ার ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।[৬৬]

সুতরাং সুস্থ আক্বল কখনোই কুরআন ও সন্নাহবিরোধী হতেই পারে না। তবে আক্বল যদি কুরআন সুন্নাহর আলোয় দ্বীপ্তিময় না হয় তাহলে আক্বল প্রবৃত্তির মুখপাত্রর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যাকে একরোখা যুক্তি বলা যেতে পারে। যেটাকে কুরআনবাদীরা আক্বল হিসেবে ব্যবহার করছে। কুরআনবাদী নেতা জামাল বান্না বলেছেন :

مبرهنا على ما يقول بكلام محمد عبده: لا يصح أن يؤخذ الإيمان بالله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الكتب المنزلة، وإنما لا بد أن يصل الإنسان إلى معرفة الله أولا بعقله.

মুহাম্মাদ আবদুহু-এর কথাই আমাদের যুক্তির প্রমাণ; রাসূল ﷺ এর কথা কিংবা নাযিলকৃত কিতাবের ওপর ভিত্তি করে ঈমান গ্রহণ করা সঠিক নয়, বরং সর্ব প্রথম আক্বলের ভিত্তিতে আল্লাহর পরিচয় গ্রহণ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য। অর্থাৎ; যুক্তির ভিত্তিতে আল্লাহর ওপর ঈমান গ্রহণ করা অপরিহার্য।[৬৭]

আর এ যুক্তি জামাল বান্নাদের নয় বরং তারা প্রাচ্যবিদদের কাছ থেকেই এ যুক্তিগুলো ধার করেছে এবং এ যুক্তির আলোকে তারা কুরআনকেই অস্বীকার করেছে।

যুক্তির ভিত্তিতে কুরআনবাদ কর্তৃক কুরআনকেই অস্বীকার

যে যুক্তিকে তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করার একমাত্র মাধ্যম বলে বিশ্বাশ করে সেই যুক্তিতেই তারা কুরআনকে অস্বীকার করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ;

(ক). আমর বিন উবাইদ বিন বাব, যিনি হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীর কুরআনবাদী নেতা ছিলেন। তার দাবি অনুযায়ী কুরআনের সূরা লাহাব সূরা ইউসুফ কোনোভাবেই কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৬৮]

(খ). ড. রাশাদ খলিফা, যিনি নিজকে নাবী দাবি করা কুরআনবাদী মিসরীয় নেতা ছিলেন, তার দাবি অনুযায়ী কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন সূরার শুরুতে উল্লেখিত الحروف المقطعة বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো কুরআন নয়।[৬৯]

তিনি আরো দাবি করেন যে, কুরআনুল কারীমে উল্লেখিত দুটি আয়াতে কারীমা-

---

[৬৫] সূরা আন-নিসা আয়াত : ৬৫।
[৬৬] মাজমুউল ফাতাওয়া ৩/৩৩ ৯পৃ.।
[৬৭] আল ইসলামু ওয়াল আক্বলানিয়্যাহ : ২৫-২৬পৃ.।
[৬৮] তারীখে বাগদাদী : ১৪/৬২পৃ.।
[৬৯] মাজমুউল ফাতাওয়া বিন বায (রহ) ২/৪০০-৪০৪পৃ.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ - فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.

তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদেরকে যা কিছু কষ্ট দেয়। তা তার কাছেও অনেক কষ্টকর। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী ও মু'মিনদের প্রতি করুণাশীল ও দয়ালু। এরপরও যদি তারা বিমুখ থাকে, তবে তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোনো সত্য মা'বুদ নেই। আমি তাঁর ওপরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।[৭০]

কুরআনবাদী রাশাদ খলিফার দাবি হলো, এদু'টি আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেননি বরং শয়তান নাযিল করেছে!!!? (আউযুবিল্লাহি মিন যালিক)

(গ). ড. ইসমাঈল মানসুর, তিনি একজন মিসরীয় কুরআনবাদী নেতা। তার দাবি হলো শাস্তিবিধান সংক্রান্ত কোনো আয়াতই কুরআনের অংশ নয়।

(ঙ). সৈয়দ আহমাদ খান, একজন ভারতীয় কুরআনবাদী নেতা। তিনি জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত ও হাশর সংক্রান্ত কোনো আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করেন না।

এছাড়াও কুরআনবাদের আরো অনেক নেতা রয়েছেন যারা আয়াতুল কুরছি, সূরা নাস ও সূরা ফালাক এবং নাবী ﷺ-এর রিসালাত সংক্রান্ত কোনো আয়াতকে কুরআনের অংশ বলে বিশ্বাস করে না।

মূলত শরীয়তে এরকম অর্থহীন অসুস্থ যুক্তির কোনো স্থান নেই কারণ, যারা নাস্তিক্যবাদে জড়িয়ে পড়ছে তারাও যুক্তি ব্যবহার করছে। যারা ফ্রি সেক্সের দাবি করছে তারা যুক্তি দিয়েই সে দাবি করছে। আবার যারা সমলিঙ্গের বিবাহের দাবি করছে তারা তা যুক্তি দিয়েই করছে। এমনকি যারা লিঙ্গ পরিবর্তন করার দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে, তারা যুক্তি ব্যবহার করেই যাচ্ছে। এছাড়া প্রত্যেক অপরাধী তাদের অপরাধের পিছনে যুক্তি দাঁড় করিয়ে কথা বলে থাকে। তাহলে কুরআনবাদীরা কি সকল অপরাধের বৈধতা দিবে? সুতরাং যুক্তি কোনোভাবেই শরীয়তের মাপকাঠি তো নয়ই বরং তা কোনো আদর্শেরই মাপকাঠি হতে পারে না। কাজেই কুরআন সুন্নাহর ওপর আক্বল বা যুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া শুধু মূর্খতাই নয় বরং তা মস্তিষ্কের বিকৃতিও বটে। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

[৭০] সূরা আত-তাওবা আয়াত : ১২৮-১২৯।

স্বাস্থ্য টিপস

❖ **প্রতিদিন অন্তত ৮-১০ গ্লাস পানি পান করুন**-শরীরকে সতেজ রাখে এবং পানিশূন্যতা প্রতিরোধ করে।

❖ **জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক খাবেন না।** সব জ্বরের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হয় না।

❖ **সাবান দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড হাত ধোয়া** অনেক সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে কার্যকর।

❖ **উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করুন** এবং ওষুধ বন্ধ করবেন না।

❖ **প্রতিদিন অন্তত ৩০ মিনিট হাঁটুন।** এটি হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস ও স্থূলতার ঝুঁকি কমায়।

❖ **ফল ও শাকসবজি বেশি খান,** অতিরিক্ত লবণ ও চিনি কমান।

❖ **পর্যাপ্ত ঘুম (৭-৮ ঘণ্টা)** শরীর ও মস্তিষ্ক সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ।

❖ **ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিহার করুন।** এগুলো ক্যান্সার ও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

❖ **মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ কখনো ব্যবহার করবেন না।**

❖ **অসুস্থ হলে নিজে নিজে ওষুধ না খেয়ে নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।**

সতর্কতা : এগুলো সাধারণ স্বাস্থ্যসচেতনতার পরামর্শ। কোনো রোগের লক্ষণ দেখা দিলে বা সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে অবশ্যই যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

নির্মল হৃদয়

শাইখ ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ ❖

[পূর্ব প্রকাশের পর]

দ্বিতীয়ত : رضا المسلم عن ربه তথা আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা

মুসলিমের তার রবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা বলতে বোঝায়, তাঁর সকল সিদ্ধান্ত, তাকদীর ও ফয়সালাকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকা।[৭১]

ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা বান্দার হৃদয়ের নিরাপত্তার দ্বার উন্মুক্ত করে। এর ফলে হৃদয় প্রতারণা, কপটতা ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র ও নির্মল হয়ে যায়। আল্লাহর আযাব থেকে কেবল সে ব্যক্তিই মুক্তি পাবে, যে আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হবে। আর অসন্তোষ ও অখুশি থাকা অবস্থায় হৃদয়ের বিশুদ্ধতা কল্পনাও করা যায় না। বান্দা যত বেশি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হবে, তার হৃদয় তত বেশি নিরাপদ ও নির্মল হবে। কারণ অন্তরের ময়লা, কপটতা ও প্রতারণা অসন্তোষের সঙ্গী; আর হৃদয়ের বিশুদ্ধতা, কল্যাণকামিতা ও আন্তরিকতা সন্তুষ্টির সঙ্গী। তদ্রূপ হিংসা হলো অসন্তোষের ফল, আর হিংসামুক্ত হৃদয় হলো সন্তুষ্টির ফল।"[৭২] তাই বলা যায়, ইখলাস হৃদয়কে শিরক ও রিয়ার রোগ থেকে মুক্ত করে, আর আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ ও অসন্তোষ থেকে মুক্ত করে। আর এভাবেই বান্দা ধীরে ধীরে قلب سليم তথা নির্মল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত : تلاوة القرآن তথা কুরআন তিলাওয়াত করা

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত অন্তরের রোগসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। তবে এর জন্য এমন হৃদয় প্রয়োজন, যা সত্যকে গ্রহণ করে এবং মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ 'হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং অন্তরে যা আছে তার জন্য আরোগ্য এসেছে।'[৭৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 'আমি কুরআনের এমন আয়াত অবতীর্ণ করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমতস্বরূপ।'[৭৪]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, "কুরআন হলো হৃদয় ও শরীরের সকল রোগের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সব ব্যাধির প্রতিকার। তবে সবাই এর দ্বারা আরোগ্য লাভের যোগ্যতা ও তাওফিক পায় না। যখন কোনো রোগী সত্যতা, ঈমান, পূর্ণ গ্রহণযোগ্যতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে কুরআনের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করে এবং এর শর্তগুলো পূর্ণ করে, তখন কোনো রোগই তার মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারে না। যমীন ও আসমানের প্রতিপালকের সেই কালামের সামনে রোগ কীভাবে টিকে থাকতে পারে, যার প্রভাব পাহাড়ের ওপর নাযিল হলে তা বিদীর্ণ হয়ে যেত, আর জমিনের ওপর নাযিল হলে তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেত! হৃদয় ও দেহের এমন কোনো রোগ নেই, যার চিকিৎসা, কারণ ও প্রতিরোধের নির্দেশনা কুরআনে নেই, যদি আল্লাহ কাউকে তাঁর কিতাবের গভীর উপলব্ধি দান করেন।"[৭৫] বস্তুত কুরআন কেবল তিলাওয়াতের গ্রন্থ নয়; এটি হৃদয়ের হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ, অহংকার, লোভ ও গাফিলতির মতো রোগের মহৌষধ। তাই নিয়মিত এর তিলাওয়াত, অর্থ অনুধাবন এবং তার আলোকে আমল করার মাধ্যমে হৃদয়কে সুস্থ ও পবিত্র রাখা আমাদের কর্তব্য।

চতুর্থত : حسن الظن بالمسلمين তথা মুসলিমদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করা

অপরাপর মুসলিম ভাইদের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখা অন্তরের পবিত্রতা ও সুস্থতা লাভের অন্যতম উপায়। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর

❖ আরবী প্রভাষক, হানাইল নো'মানিয়া কামিল মাদরাসা, জয়পুরহাট ও সহ-সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস জয়পুরহাট জেলা।

[৭১] মাদারিজুস সালিকীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩।
[৭২] মাদারিজুস সালিকীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৭।
[৭৩] সূরা ইউনুস আয়াত : ৫৭।
[৭৪] সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত : ৮২।
[৭৫] যাদুল মা'আদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫২।

সাহাবীদের একজন আমাকে লিখেছিলেন- "তোমার ভাইয়ের কাজকে সর্বোত্তম অর্থে গ্রহণ করো, যতক্ষণ না এমন কিছু তোমার কাছে আসে যা তোমাকে তা থেকে ফিরিয়ে দেয়। কোনো মুসলিমের মুখ থেকে বের হওয়া কোনো কথাকে মন্দ অর্থে ব্যাখ্যা করো না, যদি তার ভালো কোনো ব্যাখ্যা পাও। আর যে ব্যক্তি নিজেকে সন্দেহের জায়গায় উপস্থাপন করে, সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে"।'[৭৬] তাই বলা যায়, সুধারণা মানুষের হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ ও কু-ধারণা থেকে রক্ষা করে। মুসলমানদের মধ্যে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পঞ্চমত : النصيحة তথা উপদেশ প্রদান করা

অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম কারণ হলো মুসলমান ভাইদের কল্যাণ কামনা করা এবং তাদের ভুল দেখলে গোপনে আন্তরিকভাবে উপদেশ দেয়া। এই নসীহত এমনভাবে হতে হবে যাতে অপমান, তিরস্কার বা জনসমক্ষে হেয় করার কোনো বিষয় না থাকে। প্রয়োজনে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নরম ভাষায় উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। সালফে সালেহীন যখন কাউকে নসীহত করতে চাইতেন, তখন তারা তা গোপনে করতেন। কারণ গোপনে উপদেশ দেয়া হলো আন্তরিক কল্যাণকামিতার পরিচায়ক, আর জনসমক্ষে উপদেশ দেয়া অনেক সময় অপমান ও ভর্ৎসনার কারণ হতে পারে। কোনো কোনো সালাফ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইকে নির্জনে উপদেশ দেয়, সে প্রকৃতপক্ষে তাকে নসীহত করে। আর যে জনসমক্ষে উপদেশ দেয়, সে মূলত তাকে ভর্ৎসনা ও অপমান করে। এ প্রসঙ্গে ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) নসীহতকারী ও দোষ-অনুসন্ধানকারীর পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন, 'মুমিন মানুষের দোষ গোপন রাখে এবং নসীহত করে; পক্ষান্তরে পাপাচারী মানুষের দোষ প্রকাশ করে এবং তাকে লাঞ্ছিত করে'।[৭৭]

এ ব্যাপারে আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত মূল্যবান কিছু উপদেশ দিয়েছেন, 'ভাইয়ের ভুল ধরিয়ে দেয়া তাকে হারিয়ে ফেলার চেয়ে উত্তম। আর এমন কে আছে যে তার ভাইকে সম্পূর্ণ নির্ভুল অবস্থায় পায়? তোমার ভাইকে তার প্রাপ্য দাও, তার প্রতি কোমল হও। কোনো হিংসুকের কথা শুনে তার বিরুদ্ধে যেও না, নতুবা তুমিও তার মতো হয়ে যাবে। কাল হয়তো মৃত্যু এসে তাকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। তখন তার মৃত্যুর পর কাঁদবে কীভাবে, যখন জীবিত অবস্থাতেই তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলে?"[৭৮] বস্তুত প্রকৃত মুমিনের উদ্দেশ্য থাকা উচিত তার ভাইকে সংশোধন করা, অপমান করা নয়। ছোটখাটো ভুলের কারণে তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক নষ্ট করা উচিত নয়। হিংসুক ও পরনিন্দাকারীদের কথায় প্রভাবিত হয়ে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট করা অনুচিত। তাই নসীহত হবে আন্তরিকতা, দয়া ও কল্যাণকামিতার ভিত্তিতে; কারণ গোপন নসীহত ভালোবাসার নিদর্শন, আর প্রকাশ্যে অপদস্থ করা শত্রুতার লক্ষণ। তাই চলুন! মৃত্যুর আগেই আমাদের নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কগুলো ঠিক করে নিই, কারণ মৃত্যুর পর অনুশোচনা করে আর লাভ হবে না।

ষষ্ঠত : الدعاء بسلامة القلب তথা নির্মল হৃদয়ের জন্য দু'আ করা

একজন মুসলিমের জন্য উচিত আল্লাহ তা'আলার কাছে এই দু'আ করা যে, আল্লাহ যেন তার হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও পরশ্রীকাতরতা থেকে পবিত্র রাখেন। কেননা অন্তরের পবিত্রতার জন্য দু'আ করা আল্লাহর নেক বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

'আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদের ক্ষমা করুন, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর মুমিনদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি অতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু"।'[৭৯]

---

[৭৬] বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩।
[৭৭] জামিউল উলুম ওয়াল হুকম, পৃ. ৭৭।
[৭৮] সিফাতুস সাফওয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪ ।
[৭৯] সূরা আল-হাশর আয়াত : ১০।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত নিম্নোক্ত দু'আ করতেন, رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي "হে আল্লাহ! আমার তাওবা কবুল করুন, আমার গুনাহ মুছে দিন, আমার দু'আ কবুল করুন, আমার প্রমাণকে সুদৃঢ় করুন, আমার হৃদয়ে হিদায়াত দিন, আমার জিহ্বাকে সঠিক রাখুন এবং আমার অন্তরের বিদ্বেষ দূর করে দিন।"[৮০]

এছাড়াও আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ "হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়গুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিন।"[৮১] আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে এই দু'আ করতেন, يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ "হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের ওপর অবিচল রাখুন।"

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো আপনার প্রতি এবং আপনার আনীত দ্বীনের প্রতি ঈমান এনেছি, তারপরও কি আপনি আমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করেন?" তিনি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ। নিশ্চয়ই হৃদয়সমূহ আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে রয়েছে; তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তা পরিবর্তন করেন।"[৮২]

সপ্তমত : إفشاء السلام তথা সালামের প্রচলন করা

সালাম প্রচার করা মুসলিমদের হৃদয়ের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে, পরস্পরের দূরত্ব কমায় এবং শত্রুতা ও বিদ্বেষ দূর করে দেয়। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমান আনো, আর ঈমান পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলব না, যা করলে তোমরা পরস্পরে ভালোবাসতে পারবে? তোমরা একে অপরের মধ্যে সালামের প্রচলন কর।'[৮৩] বস্তুত সালাম আদান প্রদান কেবল একটি অভিবাদন নয়; এটি হৃদয়ের ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। সমাজে সালাম ছড়িয়ে দিলে পরস্পর দূরত্ব কমে, মন পরিষ্কার হয় এবং সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

অষ্টমত : الهدية তথা উপহার আদান প্রদান করা

পরস্পরের মাঝে উপহারের আদান প্রদান মানব হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। মানুষের অন্তর স্বভাবতই তার প্রতি আকৃষ্ট হয় যে তার প্রতি ভালো আচরণ করে। তাই হাদিয়া পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে, বিদ্বেষ ও হিংসা দূর করে এবং পারস্পরিক সম্মান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, تَهَادَوْا تَحَابُّوا 'তোমরা একে অপরকে উপহার দাও, তাহলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে।'[৮৪] মূলত হাদিয়া বড় বা ছোট হওয়া জরুরী নয়; বরং এর মাধ্যমে যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়, সেটাই মূল বিষয়। এটি পারস্পরিক সম্পর্ককে মজবুত করে এবং অন্তরের শুদ্ধতা বৃদ্ধি করে।

পরিশেষে বলা যায়, নির্মল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া জান্নাত লাভের অন্যতম প্রধান কারণ। কুরআন তিলাওয়াত, মুসলিমদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ, আন্তরিক নসীহত প্রদান, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং নিয়মিত দু'আর মাধ্যমে একজন মুমিন তার হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ ও কপটতা থেকে মুক্ত রাখতে পারে। আখেরাতে কেবল সুস্থ ও নির্মল হৃদয়ের অধিকারীরাই আল্লাহর সামনে শিরক-বিদ'আত ও বিদ্বেষমুক্ত এবং পরিপূর্ণ ঈমানের সাথে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে সফলকাম হবে।

---

[৮০] আবূ দাঊদ হা : ১৩৩৭; সহীহ।
[৮১] সহীহ মুসলিম হা : ২৬৫৪।
[৮২] তিরমিযী হা : ১৭৩৯; সহীহ।
[৮৩] সহীহ মুসলিম হা : ৫৪।
[৮৪] আল-আদাবুল মুফরাদ হা : ৪৬২; সহীহ।

তাফসীরের ক্ষেত্রে ইসরাঈলী বর্ণনার প্রভাব : একটি পর্যালোচনা

আব্দুর রঊফ ❖

(৩য় পর্ব)

বাতিল ইসরাঈলী বর্ণনার প্রসিদ্ধ কিছু উদাহরণ ও সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা :

যে সকল বাতিল ইসরাঈলী বর্ণনার ভিত্তি ইসলামি শরীয়তে নেই, যার সত্যতা শরীয়তে স্বীকৃত নয়, যা মিথ্যায়ন করা হয়েছে, এমন কিছু প্রসিদ্ধ বাতিল বর্ণনা-কাহিনী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১ নং উদাহরণ : সূরা বাক্বারার وَاتَّبَعُوا مَاتَتْلُواالشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ আয়াতের তাফসীরে। “সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত।” [৮৫]

তাফসীরে বলা হয়েছে, ‘তাঁর রাজত্ব যখন হাতছাড়া হয়, তখন শয়তানেরা যাদুর সামগ্রী তাঁর সিংহাসনের নিচে দাফন করে রেখেছিল।’ সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনী বিশ্বাস্য নয়। কারণ-

প্রথমত : তা ইসরাঈলী বর্ণনা। আর দ্বিতীয়ত মহান আল্লাহ নবীগণকে হেফাজত করেছেন এবং তাঁদের মর্যাদার সাথে এমন কাহিনী সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

২নং উদাহরণ :

সূরা ইউসুফে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لَايَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾

“এটা এ জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।” [৮৬]

তাফসীরে বলা হয়েছে, ‘এ সাফাই এ জন্য, যাতে সে (আযীয) জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে (তার স্ত্রীর ব্যাপারে) আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।’

উক্ত তাফসীর থেকে বুঝা যায় যে, এ কথার বক্তা ছিলেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম। অথচ অনেক তাফসীরকারকের নিকট এটাও যুলাইখারই উক্তি ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর অনুপস্থিতিতেও তাকে মিথ্যাভাবে অপবাদ দিয়ে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করব না। বরং আমানতদারীর চাহিদা সামনে রেখেই আমি আমার ভুল স্বীকার করছি। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার স্বামীর খিয়ানত করিনি এবং কোন বড় পাপ করিনি। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়েম ও ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। [৮৭]

৩ নং উদাহরণ :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ “তারা তোমাকে যুলক্বারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে---।” [৮৮]

জালালুদ্দীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, ‘তাঁর নাম সেকান্দার।’ কিন্তু এমন কোনো সহীহ দলীল নেই, যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, যুলকারনাইনের নাম সেকান্দার।

যুলক্বারনাইন-এর শাব্দিক অর্থ হল দুই শিংবিশিষ্ট। আর তাঁর নামকরণের কারণ তাঁর মাথায় বাস্তবেই দুটি শিং ছিল। কিংবা কারণ এই যে, তিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে পৌছে সূর্যের (উদয়-অস্তের সময় তার)শিং বা কিরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর মাথায় শিঙের মতো চুলের দুটি ঝুঁটি ছিল। পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের মতানুসারে তিনি হলেন রোমের আলেকজান্ডার, যাঁর রাজত্ব ছিল পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত। কিন্তু আধুনিকযুগের মুফাসসিরগণ অভিনব ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোকেই তাঁদের সাথে একমত নন।

৪ নং উদাহরণ :

حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ ‘চলতে চলতে সে (যুলক্বারনাইন) যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী

❖ পিএইচ.ডি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া। সহকারী অধ্যাপক, শরীফবাগ ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, ধামরাই, ঢাকা। সাবেক শুব্বান সভাপতি, ঢাকা ও মানিকগঞ্জ জেলা।

[৮৫] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ১০২।
[৮৬] সূরা ইউসুফ আয়াত : ৫২।
[৮৭] তাফসীর ইবনে কাসীর : প্রাগুক্ত।
[৮৮] সূরা কাহাফ আয়াত : ৮৩।

স্থলে পৌঁছল--।[৮৯] জালালুদ্দীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন, সে পর্বত হল তুর্কী দেশের শেষ প্রান্ত। অথচ এর কোনো দলীল নেই।

৫ নং উদাহরণ : وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ "আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের ওপর রাখলাম একটি দেহ; অতঃপর সুলাইমান (আমার) অভিমুখী হল।[৯০]

কোনো কোনো মুফাসসির লিখেছেন, ولقد فتنا سليمانএর অর্থ হলো-

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ ابْتَلَيْنَاهُ بِسَلَبِ مُلْكِهِ وَذَلِكَ لِتَزَوِّجِهِ بِامْرَأَةٍ هَوَاهَا وَكَانَتْ تَعْبُدُ الصَّنَمَ فِي دَارِهِ مِنْ غَيْرِعِلْمِهِ﴾

অর্থাৎ, 'আমি তার রাজত্ব কেড়ে নিয়ে তাকে পরীক্ষা করেছিলাম।' ব্যাপারটা ছিল, তিনি এক মহিলাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সে তাঁর অজান্তে তাঁরই প্রাসাদে মূর্তিপূজা করত।[৯১]

"ثم أناب" رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فَلَبِسَهُ وَجَلَسَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ

অর্থাৎ, 'সুলাইমান অভিমুখী হল' মানে তিনি কিছুদিন পর নিজ রাজত্বে ফিরে এলেন। অতঃপর নিজ আংটি পরিধান করে সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

অথচ মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবীর মান-সম্মান রক্ষা করেছেন। তবে তাঁর এই পরীক্ষা কী ছিল, সিংহাসনে রাখা নিষ্প্রাণ দেহটি কিসের ছিল? তা সিংহাসনে রাখার অর্থ কী? এসব বিবরণ কুরআন পাকে বা কোনো সহীহ হাদীসে বিদ্যমান নেই। তবে কোনো কোনো তাফসীরবিদ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত একটি ঘটনাকে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বলে ব্যক্ত করেছেন।

ঘটনার সারমর্ম হল যে, একবার সুলাইমান (আলায়হিস সালাম) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, আজ রাতে আমি আমার (৭০ বা ৯০ জন) সকল স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করব, যাতে প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে গেলেন। যাতে ফল এই দাঁড়ালো যে, স্ত্রীগণের মধ্যে মাত্র একজন গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর গর্ভ থেকে একটি মৃত ও অসম্পূর্ণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যদি সুলাইমান (আলায়হিস সালাম) 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তাহলে তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভ থেকে তাঁর আশানুরূপ এক একটি মুজাহিদ সন্তান ভূমিষ্ঠ হত।"[৯২]

এই সকল তাফসীরবিদদের মতে সম্ভবতঃ 'ইনশাআল্লাহ' না বলা বা শুধু নিজ তদবীরের ওপর ভরসা করাটাই ফিতনা বা পরীক্ষা ছিল, যে ফিতনায় সুলাইমান (আলায়হিস সালাম)-কে ফেলা হয়েছিল। আর সিংহাসনের ওপর নিক্ষিপ্ত দেহ ঐ অসম্পূর্ণ বাচ্চা। আর আল্লাহই ভালো জানেন।[৯৩]

৬ নং উদাহরণ :

মহান আল্লাহ দাউদ (আলায়হিস সালাম) এর কাহিনী বর্ণনায় বলেছেন, وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ - إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ -

তোমার নিকট বিবাদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন ওরা প্রাচীর ডিঙিয়ে উপাসনাকক্ষে প্রবেশ করল এবং দাউদের নিকট পৌঁছল, তখন সে ভীত হয়ে পড়ল। ওরা বলল, ভীত হবেন না, আমরা বিবাদমান দুই ব্যক্তি; আমাদের একে অপরের ওপর যুলুম করেছে; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করুন।[৯৪]

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الخطاب.

---

[৮৯] সূরা কাহফ আয়াত : ৯৩।
[৯০] সূরা সোআদ আয়াত : ৩৪।
[৯১] সূরা সোআদ আয়াত : ৩৪ এর তাফসীর, তাফসীরে জালালাইন।
[৯২] সহীহ বুখারী হা : ২৮১৯, সহীহ মুসলিম হা : ৪৩৭৫-৪৩৭৯।
[৯৩] তাফসীর ইবনে কাসীর: দারুত তায়্যিবা প্রকাশনী, ৮ম খণ্ড, ২৮৫
[৯৪] সূরা সুআদ আয়াত : ২১-২২।

‘এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা, আর আমার আছে একটি; তবুও সে বলে, আমাকে এটি দিয়ে দাও এবং তর্কে সে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।”[৯৫] কোনো কোনো মুফাসসির দুম্বার ব্যাখ্যায় লিখেছেন ‘স্ত্রী’। জালালুদ্দীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) দুম্বার ব্যাখ্যায় লিখেছেন ‘স্ত্রী’। বলেছেন, আরবীতে এমন প্রয়োগবিধি প্রচলিত আছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা কুরআনের স্পষ্টার্থের পরিপন্থী। সুনিশ্চিতভাবে ইসরাঈলী বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত।[৯৬]

কিন্তু প্রশ্ন থাকে, দাউদ (আলায়হিস সালাম)-এর উক্ত কাহিনী যদি মহিলা-সংক্রান্ত ব্যাপার না হয়, তাহলে তওবা ও সিজদা কিসের জন্য ছিল? দাউদ (আলায়হিস সালাম)-এর সে কাজ কী ছিল, যার জন্য তাঁকে ত্রুটি স্বীকার এবং তওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুতাপ প্রকাশ করার অনুভূতি হল, অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন?

কুরআন কারীমে এর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না এবং কোনো সহীহ হাদীসেও এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট বর্ণনা নেই। ফলে কোনো কোনো তাফসীরবিদ ইসরাঈলী বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে এমনও কথা লিখেছেন, যাতে একজন নবীর মর্যাদাহানি হয়।

ইবনে কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ বিষয়ে এই নীতি অবলম্বন করেছেন যে, যখন কুরআন ও হাদীস এ বিষয়ে চুপ আছে, তখন আমাদেরও এর পেছনে পড়া উচিত নয়।[৯৭]

তাফসীরবিদদের এক দল, যারা উক্ত ঘটনার কিছু বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়ের কিছু ব্যাখ্যা হয়ে যায়। এর পরেও তাঁরা কোনো এক রকম ব্যাখ্যায় সর্বসম্মত নন। সুতরাং কেউ কেউ বলেন যে, দাউদ (আলায়হিস সালাম) কোনো এক সৈনিককে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আদেশ করেছিলেন। এটা ঐ সময়ে কোনো দোষের বিষয় ছিল না। দাউদ (আলায়হিস সালাম) সেই মহিলার গুণাবলী ও চারিত্রিক পরিপূর্ণতার কথা জানতেন। যার ফলে তাঁর মনে এই ইচ্ছার সঞ্চার হয়েছিল যে, সাধারণ নারী না থেকে তাকে একজন রাণী হওয়া দরকার। যাতে তার গুণাবলী ও চারিত্রিক পূর্ণতা দ্বারা পুরো দেশ উপকৃত হতে পারে। এ রকম ইচ্ছা যতই ভাল চিন্তা-ভাবনা নিয়ে করা হোক, কিন্তু প্রথমত একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় এ কাজ এক প্রকার অশোভনীয়। দ্বিতীয়ত এই কথা বাদশার পক্ষ থেকে প্রকাশ করাতে এক ধরনের চাপ প্রয়োগ করার শামিল ছিল। ফলে দাউদ (আলায়হিস সালাম) কে অভিনীত ঘটনা দ্বারা তা অশোভনীয় হওয়ার উপলব্ধি প্রদান করা হল এবং সত্য-সত্যই তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন।

অনেকে বলেন, মুকাদ্দামা নিয়ে আগত ব্যক্তিদ্বয় ফেরেশতা ছিলেন, যাঁরা একটি কাল্পনিক মুকাদ্দামা নিয়ে এসেছিলেন। এখানে দাউদ (আলায়হিস সালাম) এর ভুল এই ছিল যে, তিনি বাদীর কথা শুনেই ফায়সালা করে দিলেন এবং বিবাদীর কথা শোনার প্রয়োজন মনে করলেন না। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য এই রকম পরীক্ষা করলেন। এই ভুল উপলব্ধি করতে পেরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর পরীক্ষা ছিল। অতএব তিনি আল্লাহর দরবারে মাথা নত করলেন।

অনেকে বলেন যে, আগত ব্যক্তিদ্বয় ফেরেশতা নয়, মানুষ ছিল এবং এটা কাল্পনিক ঘটনা নয়, বরং সত্য ঝগড়াই ছিল; যার ফায়সালা নেওয়ার জন্য তারা এসেছিল। এইভাবে তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। কারণ উক্ত ঘটনাতে অসহনীয় ও ক্রোধ-উদ্রেককর বেশ কিছু আচরণ ছিল।

প্রথম : অনুমতি ছাড়াই প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করা।

দ্বিতীয় : ইবাদতের বিশেষ সময়ে এসে বাধা সৃষ্টি করা।

তৃতীয় : তাদের ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা (অবিচার করবেন না ইত্যাদি) যা তাঁর বিচারীয় পদের মর্যাদা হানিকর ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন, ফলে তিনি ক্রোধান্বিত না হয়ে পরিপূর্ণ ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেন। তার অন্তরে যে প্রকৃতিগত সামান্য বিরাগ সঞ্চার হয়েছিল, তাকেই

[৯৫] সূরা সুআদ আয়াত : ২৩।
[৯৬] তাফসীরে জালালাইন, সূরা সোআদ আয়াত ২৩।
[৯৭] তাফসীর ইবনে কাসীর : প্রাগুক্ত।

তিনি আপন ভুল ভেবেছিলেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা ছিল, তাই এরূপ প্রকৃতিগত বিরাগ সঞ্চার না হওয়াই উচিত ছিল। যার জন্য তিনি আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়েছিলেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

৭ নং উদাহরণ :

এই শ্রেণীর তাফসীরের অনুরূপ কিছু তাফসীর আছে, যা ভিত্তিহীন কাহিনী মাত্র। যা নবীর শানের খেলাফ। যেমন-

﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا-﴾

'আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।[৯৮]

উক্ত আয়াতের শানে নুযুল বিষয়ে কোনো কোনো মুফাসসির যে কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তাতে সন্দেহ আছে। আর এ কাহিনীতে রয়েছে নবী ﷺ-এর মানহানির মতো লজ্জাজনক ব্যাপার। জালালুদ্দীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) লিখেছেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিপরীত) ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।' (এ আয়াত আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ও তাঁর বোন যয়নাবের শানে অবতীর্ণ হয়েছে, -----ফলে নবী ﷺ-এর হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং যায়দের হৃদয়ে তাঁর প্রতি ঘৃণা স্থান পেল। অতঃপর যায়দ নবী ﷺ-কে বললেন, আমি ওকে তালাক দিতে চাই।)[৯৯]

পক্ষান্তরে নবী ﷺ বলেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না---' যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। ---- আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।"[১০০]

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾

"তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন" এই কথার ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন, 'তা ছিল যয়নাবের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং এই কামনা যে, যায়দ তাকে তালাক দিলে, তিনি তাকে বিবাহ করবেন। অথচ এ কথা প্রমাণিত নয় এবং বস্তুত তা বিবেকগ্রাহ্যও নয়। কারণ তা নবুয়াতের মর্যাদার পরিপন্থী। বরং সঠিক কথা হল তাই, যা হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন। তিনি বলেন-

لا ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال: اتق الله، وأمسك عليك زوجك. فقال: قد أخبرتك أني مُزَوِّجكها، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وهكذا رُوي عن السُّدِّي أنه قال نحو ذلك.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর নবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি (যয়নাব) তাঁর অন্যতম স্ত্রী হবেন। অতঃপর যখন যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাছে নিজ স্ত্রী (যয়নাবের) অভিযোগ নিয়ে এলেন, তখন নবী তাঁকে বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ বললেন, আমি তো তোমাকে খবর দিয়েছি যে, তোমার সাথে আমি তার বিয়ে দেব। আর তুমি তা গোপন করছ, যা আল্লাহ প্রকাশ

[৯৮] সূরা আল-আহযাব আয়াত : ৩৬।
[৯৯] তাফসীরে জালালাইন, সূরা আহযাব আয়াত : ৩৬।
[১০০] সূরা আল-আহযাব আয়াত : ৩৭।

করছেন।[১০১] **মূলত, পালিত পুত্রের স্ত্রীর প্রতি মহানবী ﷺ-এর প্রেম-ভালোবাসার যে গল্প তাফসীরের নামে পাওয়া যায়, তা বানানো রূপকথা মাত্র।** সঠিক হল, জাহেলী যুগে প্রচলিত পালক-প্রথা বাতিল করার জন্যই মহানবী ﷺ-কে তাঁর পালিতপুত্রের স্ত্রীর সাথে বিবাহ দেওয়ার কথা মহান আল্লাহ অগ্রিম জানিয়েছিলেন। আর লোকদেরকে ভয় করার অর্থ হল, তাঁর মনে এই ভয় ছিল যে, লোকেরা বলবে, দেখ মুহাম্মাদ (পালিত) পুত্রবধুকে বিবাহ করল।

মূল বিষয় হলো, সকল মুসলিম এ সমস্ত উদ্ভট মিথ্যা কাহিনীমূলক **'তাফসীরে ইসরাঈলী ও বাতিল তাফসীর'** অধ্যয়ন করে জানতে পারে যে-

১. হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম নারীর প্রেমে পড়েছিলেন। (نعوذ بالله)

২. হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম নবীও নারীর প্রেমে পড়েছিলেন । (نعوذ بالله)

৩. এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ ﷺও নারীর প্রেমে পড়ে পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন!

উপসংহার :

পরিশেষে আমরা বলবো, ইসরাঈলী রিওয়ায়েত বর্ণনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। রাসূল ﷺ বলেন,

وَحَدِّثُوا عن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

আর বানী-ইসরাঈল থেকে বর্ণনা কর, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন নিজ আশ্রয় জাহান্নামে বানিয়ে নিল।[১০২] তবে বনী ইসরাঈল হতে কেবল ইসলাম সমর্থিত বর্ণনাগুলো বলা যাবে। ব্যাপকভাবে তাদের সব রকম বর্ণনা গ্রহণ করা সমীচীন নয়। হাদীসের শেষাংশে রাসূল ﷺ-এর নামে মিথ্যা আরোপ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে এদিকেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ আমীন আশশানক্বিতী রহ. বলেন-

[১০১] তাফসীর ইবনে কাসীর : প্রাগুক্ত।

[১০২] সহীহ বুখারী হা : ৩৪৬১।

বনু ইসরাঈলের বর্ণনা যেগুলো 'ইসরাঈলিয়াত' নামে পরিচিত; তিন ধরনের হতে পারে।

১. যেগুলো বিশ্বাস করা আবশ্যক; সেগুলোর সত্যতার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহয় প্রমাণ বিদ্যমান।

২. যেগুলো অবিশ্বাস করা আবশ্যক; সেগুলো কুরআন ও সুন্নাহয় মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

৩. যেগুলো সত্য কিংবা মিথ্যা কোনোটাই বলা বৈধ না; সেগুলোর সত্য কিংবা মিথ্যা বলে কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ নেই। উক্ত তাহকিক থেকে বোঝা যায়, যে সকল কেচ্ছা-কাহিনী কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত; আমাদের অবশ্যই সেগুলো প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কেননা, সেগুলো সত্য ওহী মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিরুদ্ধে যায় যা বিকৃত বা পরিবর্তিত হয় নি। আর ঐগুলোর প্রকৃত সত্য একমাত্র আল্লাহর ইলমে আছে।[১০৩] হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমান ও ইসলামকে ইসরাঈলী বর্ণনা ও এর আগ্রাসন থেকে ভেজালমুক্ত কর । (আমীন)

ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতন হোন

বাড়ির আশপাশে কোথাও যেন পরিষ্কার বা জমে থাকা পানি না থাকে। ফুলের টব, টায়ার, ড্রাম ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করুন। মশারি ব্যবহার করুন এবং মশার কামড় থেকে নিজেকে ও পরিবারকে সুরক্ষিত রাখুন। সচেতনতাই ডেঙ্গু প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

[১০৩] মুহাম্মদ আমীন বিন মুহাম্মদ আল মুখতার আশশিনকিতী,আযওয়াউল বায়ান ফী ঈদাহিল কুরআন বিল কুরআন, ৩য় খণ্ড পৃ.৩৪৬, প্রকাশক, দারুল ফিকর, বৈরুত লিবানন,১৯৯৫/১৪১৫। মূল আরবী ইবারত:
ومن المعلوم أن ما يروى عن بني إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات في واحدة منها يجب تصديقه وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه ، وفي واحدة يجب تكذيبه وهي إذا ما دل القرآن والسنة على كذبه ، وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق ,وهي ما إذا لم يثبت في كتابٍ ولا سنَّة صدقه ولا كذبه. وبهذا التحقيق تعلم أن القصص المخالفة للقرآن والسنة الصحيحة التي توجه بأيدي بعضهم زاعمين أنها في الكتب المنزلة يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص الوحي الصحيح التي لم تحرف ولم تبدل والعلم عند الله تعالى-

বাংলাদেশে কাদিয়ানিদের আগমন, বিস্তার ও সাংগঠনিক ইতিহাস

আহমাদ বিন আব্দুস সালাম [*]

১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক একটি প্রত্যন্ত গ্রামে মির্যা গোলাম আহমদ (১৮৩৫-১৯০৮) নামক একজন ব্যাক্তির হাত ধরে কাদিয়ানি ফেরকার সূত্রপাত ঘটে। তিনি ১৮৯১ সালে নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং নিজেদের আহমদীয়া বলে পরিচয় দেন।

পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশে) কাদিয়ানি মতবাদের প্রবেশ ও বিস্তারের ইতিহাসটি বৈচিত্রময় এবং তা মূলত ব্যক্তিগত অনুসন্ধান, উপনিবেশিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে ত্বরান্বিত হয়েছিল। পূর্ববঙ্গে এই মতবাদের প্রথম পরোক্ষ সূত্রপাত ঘটে ১৯০২ সালে একটি ওষুধের পার্সেলের মাধ্যমে। তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার (বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া) আইনজীবী মুন্সী দৌলত আহমদ খান লাহোরের খ্যাতনামা হাকিম মোহাম্মদ হোসেন কোরাইশীর নিকট 'মুফাররাহে আম্বারি' নামক একটি ভেষজ ওষুধের জন্য অর্ডার পাঠান। সেই ওষুধের পার্সেলের ভেতর লাহোরের ফার্মেসি থেকে আহমদিয়া মতবাদের দাবি ও উদ্দেশ্য সম্বলিত একটি প্রচারপত্র বা পুস্তিকা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। দৌলত আহমদ খান পুস্তিকাটি পেয়ে তা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তৎকালীন ঐতিহ্যবাহী সেন্ট্রাল জামে মসজিদের প্রধান ইমাম মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদের নিকট হস্তান্তর করেন এবং ১৯০২ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ দশ বছর ধরে মির্যা গোলাম আহমদের দাবি ও রচনাবলী পড়েন এবং তার সাথে দীর্ঘ চিঠিপত্র আদান-প্রদান করেন।

তবে তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে পূর্ববঙ্গের প্রথম অনুসারী হওয়ার ঘটনাটি ঘটে ১৯০৪-১৯০৫ সালের দিকে চট্টগ্রাম জেলায়। চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানার নিবাসী আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ ১৯০৫ সালে তৎকালীন বার্মার (বর্তমান মিয়ানমার) রেঙ্গুনে ডাক বিভাগে কর্মরত ছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি গুরুতর ক্রান্তীয় রোগে আক্রান্ত হন এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যান, সেখানে তিনি স্থানীয় আহমদিয়া অনুসারীদের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাদের ধর্মীয় ডকট্রিনে প্রভাবিত হয়ে ১৯০৫ সালে মির্যা গোলাম আহমদের হাতে বয়াত গ্রহণ করেন।

সারণি ১: পূর্ববঙ্গে আহমদিয়া আন্দোলনের প্রাথমিক বিস্তার ও রূপান্তরকারীদের বিবরণ (১৯০৪-১৯১২)

রূপান্তরকারীর নাম	পৈত্রিক নিবাস (জেলা)	রূপান্তরের বছর	রূপান্তরের স্থান ও মাধ্যম	ঐতিহাসিক ভূমিকা ও গুরুত্ব
আহমদ কবির নূর মোহাম্মদ	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	১৯০৫	রেঙ্গুন, বার্মা ও উত্তর-পূর্ব ভারত; চিকিৎসাকালীন সরাসরি মুরিদদের সংস্পর্শে.	পূর্ববঙ্গের প্রথম আনুষ্ঠানিক দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি.
রইস উদ্দিন খাঁ	নাগেরগাঁও কিশোরগঞ্জ	১৯০৬	কাদিয়ান ভ্রমণ; সরাসরি কাদিয়ানের খলিফাদের সংস্পর্শে.	পূর্ববঙ্গের দ্বিতীয় পুরুষ অনুসারী.
সৈয়দা আজিজাতুন্নিসা	নাগেরগাঁও কিশোরগঞ্জ	১৯০৭	রইস উদ্দিন খাঁর স্ত্রী হিসেবে পারিবারিক প্রভাবে দীক্ষা.	সমগ্র বাংলার প্রথম নারী আহমদিয়া অনুসারী.
মাওলানা মোবারক আলী বাঙ্গালী	বগুড়া	১৯০৯	কাদিয়ান ভ্রমণ; প্রথম খলিফা হাকিম নূর-উদ্দীনের নিকট বয়াত.	প্রথম বাঙালি ছাত্র ও গবেষক, যিনি পরবর্তীতে ইউরোপ ও আফ্রিকায় আহমদিয়া মিশনারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন.
মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ	নাসিরপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৯১২	দীর্ঘ ১০ বছর গবেষণার পর অক্টোবর ১৯১২ সালে কাদিয়ান ভ্রমণ করে বয়াত গ্রহণ.	পূর্ববঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সাংগঠনিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারের অগ্রদূত.

মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদের বয়াত গ্রহণের পর পূর্ববঙ্গে আহমদিয়া আন্দোলন একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ

[*] মাস্টার্স; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

করে। ১৯১২ সালের ২৫ নভেম্বর তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে এসে তাঁর শিক্ষকতার অবস্থানকে ব্যবহার করে আনুষ্ঠানিকভাবে এই মতবাদ প্রচার করতে শুরু করেন এবং বয়াত গ্রহণ সভার আয়োজন করেন। এতে স্থানীয় রক্ষণশীল আলেম সমাজ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, যার ফলে তিনি মসজিদের ইমামের পদ থেকে অপসারিত হন। ১৯১৩ সালে আব্দুল ওয়াহেদের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পূর্ববঙ্গের সর্বপ্রথম সাংগঠনিক শাখা 'আঞ্জুমানে আহমদিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথম কমিটির সভাপতি ছিলেন আব্দুল ওয়াহেদ নিজেই এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মুন্সী দৌলত আহমদ খান। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার পর অতি দ্রুত এর অনুসারী সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৯১৬ সালে সমগ্র বাংলা (পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ) এবং আসাম অঞ্চলকে সমন্বিত করে একটি বৃহত্তর সাংগঠনিক কাঠামো 'বেঙ্গল প্রোভিন্সিয়াল আঞ্জুমান' (বাংলা প্রাদেশিক আঞ্জুমান) গঠিত হয় এবং মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহেদকে এর প্রথম 'আমির' নিযুক্ত করা হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই সংগঠনের বিকাশ ঘটে ১৯১৬ সালে চট্টগ্রাম কলেজের আরবি ও ফার্সি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আব্দুল লতিফ খানের বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে। তিনি চট্টগ্রামে এই মতবাদ প্রচারের প্রথম অগ্রদূত ছিলেন এবং তার প্রচেষ্টায় ১৯২০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'আঞ্জুমানে আহমদিয়া চট্টগ্রাম' গঠিত হয়, যার প্রধান হিসেবে তিনি নিজেই দায়িত্ব পালন করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কাদিয়ানি মতবাদ সুসংগঠিতভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিল বাংলাদেশে কাদিয়ানিদের আদি ও প্রধান দুর্গ। ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ হাসিব উল্লাহ তাদের যৌথ গবেষণা নিবন্ধ "A Historiography of Ahmadiyya Muslim Jamaat in Bangladesh"[১০৪] গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাতেই পূর্ববঙ্গের প্রথম এবং বৃহত্তম আহমদিয়া বসতি গড়ে উঠেছিল। আব্দুল ওয়াহেদের প্রভাবে এই জেলার সরাইল, ঘাটুরা, নাটাই, ভাদুঘর, ছোট ব্রাহ্মণবাড়িয়া, তারুয়া, কোড্ডা, খড়মপুর, বিষ্ণুপুর, দেবগ্রাম, শালগাঁও, দুর্গারামপুর, শাহবাজপুর এবং বাশারুকসহ প্রায় ১৪টি প্রত্যন্ত গ্রামে এই মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে। আব্দুল লতিফ খানের হাত ধরে শুরু হওয়া এই মতবাদ চট্টগ্রামে ১৯২০ সালের পর দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে মুহিব্বুল্লাহ, আজমল শাহিদ এবং ফারুক আহমদের মতো প্রচারকদের তৎপরতায় গ্রামীণ চট্টগ্রামে এর ভিত্তি হয়। ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম তাঁর পূর্বোক্ত গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ১৯৮৯ সালের একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯টি স্থানে আহমদিয়া জামাত ছিল, যা পরবর্তীতে ২৬টি স্থানে উন্নীত হয়. চট্টগ্রাম শহরের চকবাজার এলাকায় তাদের প্রথম স্থায়ী উপাসনালয় ও মিশন হাউস নির্মিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলেও এই মতবাদ সুকৌশলে প্রবেশ করে। বিশেষ করে রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের কবিরপুর গ্রামের মহিলা পাড়ায় একটি নতুন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার এবং লক্ষ্মীপুর জেলায় আহমদিয়াদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি ঐতিহাসিক নথিপত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। বগুড়া জেলা ছিল কাদিয়ানি পণ্ডিত মোবারক আলী বাঙ্গালীর জন্মস্থান, যিনি ১৯০৯ সালে কাদিয়ানে গিয়ে এই ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তার প্রচেষ্টায় বগুড়ার গ্রামীণ অঞ্চলে কিছু পরিবারের মধ্যে এই মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে। রাজশাহী অঞ্চলে কাদিয়ানিদের প্রচার কাজ শুরু হয় মূলত ১৯৩০-এর দশকে। নাটোরে অবস্থিত মহারাজপুর মসজিদ ছিল এই অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র। তবে রাজশাহীতে তাদের কার্যক্রম শুরু থেকেই তীব্র সামাজিক বাধার সম্মুখীন হয়েছে। খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলায় আহমদিয়াদের আগমন ঘটে মূলত নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে) অঞ্চলের প্রচারকদের মাধ্যমে। খুলনায় একটি সুদৃশ্য আহমদিয়া মসজিদ ও মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা জেলার সুন্দরবন সংলগ্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আহমদিয়া সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, যা ২০০৪-২০০৫ সালের দিকে খতমে নবুয়ত আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে।

ঢাকায় বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচার শুরু হলেও ১৯৫০-এর দশকে বখশীবাজারে স্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এটি প্রধান প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় ১৯০৬ সালে রইস উদ্দিন খাঁর মাধ্যমে এ মতবাদের প্রথম বীজ রোপিত হয়েছিল। পরবর্তীতে কিশোরগঞ্জের বেতাল নামক স্থানে ঐতিহাসিক 'গালিম গাজী মসজিদ' প্রতিষ্ঠিত হয়, যা এ অঞ্চলের প্রাচীনতম আহমদিয়া উপাসনালয়।

সিলেট অঞ্চলে এই মতবাদের অগ্রদূত ছিলেন সুনামগঞ্জ জেলার সেলবারাস অঞ্চলের এক জমিদার পরিবারের সন্তান আহমদ তৌফিক চৌধুরী (১৯৩২-২০১৪) । মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল তার "আহমদিয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব" (ঢাকা: আহমদিয়া জামাত বাংলাদেশ, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, "আহমদ তৌফিক চৌধুরী সিলেট অঞ্চলে "খুদ্দাম-উল আহমদিয়া" (তরুণ শাখা)-র আঞ্চলিক নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানেও একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত্তি গড়ে তোলেন।"

[১০৪] রিসার্চগেট, ২০২৫, পৃষ্ঠা ১-২।

শুব্বানে পাতা صفحات الشبان

যোগ্য নেতৃত্ব ও আজকের ইয়াং জেনারেশন

মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম *

যোগ্য নেতৃত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

নেতৃত্ব মহান আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। যা ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে খুব অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়। যোগ্য নেতৃত্ব কেউ কেউ জন্মগতভাবে বংশপরম্পরায় পেয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতির কত চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সময়ের সাথে সাথে যোগ্য নেতৃত্বের গুণ অর্জন করে। সুতরাং যোগ্য নেতৃত্বের বিষয়টি আপেক্ষিক। পৃথীবির প্রেক্ষাপটে একটি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র বিনির্মাণে যোগ্য নেতৃত্বের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যোগ্য নেতৃত্ব যেমনভাবে থাকবে ঠিক তেমনিভাবে যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে নেতার নেতৃত্বর বশ্যতা স্বীকার করার উদার মানসিকতাও সমান প্রকাশ করতে হবে। এই ফাংশন কাজ না করলে শুধু নামমাত্র নেতা হবে, কিন্তু যোগ্য নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে না। নেতৃত্বের এই শৃঙ্খলাবোধ একটি সমাজ কিংবা সংগঠন, পরিবার কিংবা রাষ্ট্র সর্বত্র বহুমুখী কল্যাণ সাধন করে।

নেতা ও নেতৃত্ব সমান নয়। বরং প্রায়োগিক, বাস্তবতা ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিরিখে নেতৃত্বর অনস্বীকার্যতা অপরিসীম। নেতৃত্ব আছে বলেই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র এখনও ভারসাম্য বজায় রেখে টিকে আছে। নচেৎ এগুলোর কোনটি সঠিকভাবে টিকে থাকত না। বরং বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য সৃষ্টি হত। যা বিভিন্ন জায়গায় পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যুগে যুগে নবী এবং রাসূল প্রেরণ করেছেন মানবজাতির হিদায়াতের জন্য। একটি সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্রকে সুশৃঙ্খলিত এবং কল্যাণকামী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি মানুষের মধ্যে থেকে কতিপয় নবী, রাসূল নির্বাচন করেছেন। যেন এইসকল নবী রাসূল দক্ষতা, যোগ্যতা ও দূরদর্শিতার সাথে পথহারা, দিশাহারা, অবহেলিত, উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে সঠিক পথের দিশা ও সোনার মানুষে পরিণত করতে পারে। নবী রাসূলদের এই চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যোগ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে জীবনের কত সময় পার করিয়েছেন। কখনও মেষ বা ছাগলের রাখালের কাজ করতে হয়, কখনও দুঃস্থ, অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভাব অনটন বিমোচনের জন্য নিজেকে সঁপে দেয়া ছাড়াও কত অনুকূল এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। ফলতঃ চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁরা শুধু নেতৃত্বের আসীনে অধিষ্ঠিত হয়নি বরং বিশ্ববাসীর হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত এই নেতৃত্বের ধারার যে বহিঃপ্রকাশ তা যেমন আমাদের গ্রহণ করতে হবে ঠিক তেমনিভাবে নেতৃত্বের যে গুণ, বৈশিষ্ট্য তা বিবেচনা করত; সঠিক নেতৃত্ব গ্রহণ তারই পক্ষের শক্তি হিসেবে কাজ করবে। কেননা নেতৃত্ব ছাড়া সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির নেতার নির্দেশ শ্রবণ করা এবং আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। পছন্দ হোক কিংবা অপছন্দ হোক যতক্ষণ না তাকে নাফরমানির নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু যদি নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয় তখন সেখানে কোনো আনুগত্য নেই।[১০৫] সুতরাং এই হাদিসের বক্তব্য অনুযায়ী স্পষ্ট হল যে নেতার নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে, যা ইসলামের আদেশ। তবে এখানে শর্ত হলো ততক্ষণ পর্যন্ত মেনে নিতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আল্লাহর আনুগত্য, সৎ কাজের আদেশ করবেন। আর যদি তিনি কোনো অসৎ, গুনাহ, আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজের আদেশ করেন তাহলে তাঁর আনুগত্য করা অপরিহার্য নয়।[১০৬]

নেতা শুধু নিছক আদেশ, ফরমান জারি করার নাম নয়। বরং নেতার নেতৃত্ব একটি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র বিবিধ পরিবর্তন কল্যাণ কামনা ও অকল্যাণের যাবতীয় পথ বন্ধ করে দেয়ার নাম। নেতার নেতৃত্বর এই বশ্যতা স্বীকার করা শৃঙ্খলাবোধ যেমন শেখায় তেমন জীবন গঠনে দুনিয়াবি ও

* শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন এন্ড ইসলামীক একাডেমী, ও পাঠাগার সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস, দিনাজপুর জেলা।

[১০৫] সহীহ বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা : ৩৬৬৪।
[১০৬] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, মিশকাত হা : ৪৬৬৫।

পরকালীন মুক্তির বাস্তবভিত্তিক বিভিন্ন কলা-কৌশলও শেখা যায়। যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা প্রকাশিত।

একটি যোগ্য নেতৃত্বেই পারে একটি ভঙ্গুর সমাজকে পরিবর্তন করতে। একটি যোগ্য নেতৃত্ব পারে সমাজের যাবতীয় অনাচার, দুরাচার, নিষিদ্ধ পথের অলিগলি বন্ধ করতে। একটি যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারাই সম্ভব জালেমের জুলুম দূর করা ও মাজলুমের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করা। একটি যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা বিশ্বস্ততা ও নৈতিকতার মাধ্যমে একটি পরিবেশ সমাজ ও রাষ্ট্রকে উজ্জীবিত করতে পারে এবং নীতি নৈতিকতার ভিত্তির উপরে সকলের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত রাখতে পারে।

চলমান বাংলাদেশের নেতৃত্বের যে অবস্থা তা ভাববার বিষয়। বস্তুবাদী এ দুনিয়ায় যত মন্ত্র তন্ত্র ও কুফরি মতবাদ যেভাবে সমাজের ছত্রছায়ায় বসে গেছে এবং সেইসাথে অযোগ্যরাই যখন যোগ্যতার মসনদে বসে যোগ্যদের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে ঠিক এমন লজ্জাস্কর পরিস্থিতিতে যোগ্য নেতৃত্ব আলোচনা সময়ের দাবিও বটে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রত্যেকটি সেক্টরে যোগ্য নেতৃত্বের চরম সংকটের সময় পার করছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের যে খরা ঠিক তেমনিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যোগ্য নেতৃত্বের বিশাল হাহাকার। সুতরাং যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা এবং সমাজ, রাষ্ট্র বিনির্মাণে যোগ্য নেতৃত্বের গুরুত্বারোপ করা, পঠন, পাঠন, কলা কৌশল অবলম্বন করা জরুরি। নচেৎ ঐ বিদেশী বাবু আর দাদা বাবুরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে লোলুপ জিহ্বায় গিলে খাওয়ার উপক্রম হবে।

মহান আল্লাহ হেফাজত করুক, আমীন।

নেতৃত্বের স্বরূপ; সংকটের বাংলাদেশ : নেতৃত্ব ব্যক্তি কেন্দ্রিক হলেও এর ফলাফল সামষ্টিক ও দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণকর। এজন্য বিখ্যাত পন্ডিত 'টমাস জেফারসন' বলেন : A politician thinks for the next election but statesman thinks for the next generation 'একজন রাজনীতিবিদ (অপেক্ষা) করেন পরবর্তী নির্বাচন আর একজন নেতা সে চিন্তা করে (অপেক্ষা) পরবর্তী প্রজন্মের'। মূলতঃ বাস্তবিক অর্থে নেতৃত্ব হতেই হয় সার্বিক কল্যাণের জন্য। নেতা বিপদে আপদে তার কর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে তাদের খোঁজ খবর রাখবেন বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে নিজেকে উৎসর্গ করবেন সাধ্যমতো তাদের সাহায্য করবেন। নেতার এই উদার মানসিকতার এবং সকলের প্রতি তার যে দরদ মায়ার কারণে নেতৃত্বকে আরো বেগবান করে তোলে এবং সমাজ, রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব, অবকাঠামো অনেক শক্তিশালী করে।

কিন্তু বাংলাদেশের মতো এমন রাষ্ট্র যেখানে শতভাগ যোগ্য নেতৃত্বের সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা সঙ্গত কারণেই অবহেলিত হয়ে আছি, আর যোগ্য নেতৃত্বের জন্য জেগে জেগে ঘুমাচ্ছি!

আমাদের এই যে মানসিকতার পরাজয়, গাফিলতির এই করুণ চিত্র! যার দরুণ নেতৃত্ব ব্যক্তি, পরিবার কেন্দ্রিক, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, গুম, হত্যা, রাহাজানি, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ছাড়াও গোটা দেশ যেন বিশাল এক নরকে পরিণত হচ্ছে।

অথচ যোগ্য নেতৃত্বের ব্যাপারে ইসলামী দিকনির্দেশনা কত চমৎকারভাবে নিরূপণ করেছে সেটা আমরা আমলে নেওয়ার চেষ্টাও করি না। ইসলামের দৃষ্টিতে যোগ্য নেতৃত্ব হবে আল্লাহর আইন তথা বিধি-বিধানকে মেনে নেয়া এবং দলমত নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ কামনা করা।

বর্তমান দেশের যুবকদের কথাই যদি বলা হয় তাহলে কী বলবেন আর কী লিখবেন? আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে যে যুবকের নেতৃত্বের অপেক্ষায় গোটা দেশ তাকিয়ে আছে চাতক পাখির মতো সেই যুবকেরা পড়ে আছে নষ্ট রাজনীতির গোলকধাঁধায়। যখন নিজেকে গড়ে তোলার এক সোনালী সময় তখন সে তাঁর জীবনের সোনালী সময়কে নষ্ট করছে আমোদ- প্রমোদ, খেল-তামাশা, নেশা, জুয়া আর অবৈধ প্রেম-ভালোবাসায়। তাহলে বলুন! জাতির এই যুবকেরা কিভাবে লিডারশিপ অর্জন করবে, কিভাবে নিজেকে শাণিত করবে, কিভাবে বিশাল এই জনপদের মানুষের চাহিদা পূরণ করবে?

অথচ কথা ছিল, লিডারশিপের প্রথম সবক হাতে কলমে শেখা। নেতৃত্বের অবকাঠামো শক্ত করে ধারণ করে জাতির করুণ পরিণতির বিপরীতে দাঁড়িয়ে গোটা পচনশীল সমাজ ব্যবস্থায় নেতৃত্বের স্বরূপ উন্মোচন করা এবং এর পথ ও পন্থায় বাস্তবিক ডিজাইন তৈরি করা। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, প্রত্যেক বিভাগ, জেলা থেকে শুরু করে শহরে বন্দরে গ্রামে গঞ্জে অস্থীতিশীলতা বিদ্যমান। বিশেষত দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে চরম সংকট। গুম, খুন, সম্পদ দখল,

ডাকাতি এগুলো যেন নিত্যদিনের রুটিন। আইন শৃঙ্খলারও চরম দূর্দশা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নেতা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঠিকই কিন্তু এর কার্যকর কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না বরং বিপন্নতার দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। সুতরাং দেশের এই বৃহৎ স্বার্থে নেতৃত্বের যে সংকট তা উত্তরণের জন্য ইয়াং জেনারেশনের দায়িত্বশীল হওয়া জরুরী।

নেতৃত্বের অভিলাষ ও ইয়াং জেনারেশনের বীরত্ব : ইসলামে নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। যোগ্যরা যোগ্যতার ভিত্তিতে সঠিক ও কার্যকর নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে একটি আদর্শিক সমাজব্যবস্থা গঠনের ভূমিকা রাখবে। এজন্য রাসূল ﷺ নেতার আনুগত্য করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে বলেন :

آمركم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهـاد في سبيل الله.

'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি: দলবদ্ধভাবে থাকা, শ্রবণ করা, আনুগত্য করা, হিজরত করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ।[১০৭]

এ বিষয়কে নজরে রেখে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : জামাত ছাড়া ইসলাম শক্তিহীন এবং নেতৃত্ব ছাড়া জামাত অস্তিত্বহীন আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব অসহায়।[১০৮]

একটু লক্ষ্য করুন! নেতৃত্বের অভিলাষ না রাখলে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে কুফরী মতবাদ যেভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে শির্ক, কুফরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অশ্লীলতা, নেশায় আসক্ত এই ইয়াং জেনারেশন যেভাবে অধঃপতনের অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে সেখানে নেতৃত্বের অভিলাষ যদি হয় যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা, উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে দুনিয়ার কল্যাণ সাধনের সামগ্রিক প্রচেষ্টা তাহলে কেন বা ইয়াং জেনারেশন লিডারশিপের এই সবক থেকে পিছিয়ে থাকবে?

একটু লক্ষ্য করুন! ইসলামের ইতিহাসে যত যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে তাঁর প্রত্যেকটাই যুবকদের যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। জিহাদের উচ্চাভিলাসী চেতনা, শির উঁচু করে যে তেজস্বীয়তার বিপ্লবী গাঁথা ইতিহাস তা তো ইয়াং সাহাবীদের দ্বারাই লিখিত হয়েছে। যুবকদের নেতৃত্ব চাই তা সত্যের পথে হোক কিংবা বাতিলের পথে হোক তা মাথা নোয়াবার মতো হিম্মত নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয় না। বিশেষত ইসলামের ইতিহাসে সাহাবী, তাবে তাবেয়িসহ পরবর্তী সময়ের ইতিহাস আমাদের এমনটিই বলে। পৃথীবির সকল শক্তিকে পরাজিত করে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেছে মূলতঃ ইয়াং মুজাহিদের যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা। সুলতান সালাউদ্দিন আইয়ুবি, রুকুনুদ্দিন বাইবার্স, মুহাম্মদ বিন কাসিমসহ সকল বীর পুরুষ ছিল ইয়াং। লক্ষ্য করলে দেখবেন- তাঁদের প্রত্যেকের বয়স- ১৭-২৫ এর মধ্যে ছিল। শুধু বিজয় করেননি বরং বিশাল বাহিনীর দায়িত্ব অর্পিত ছিল। এদের সকলে যোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা বিজয়ের চূড়ান্ত স্বাদ আস্বাদন করেন।

সুতরাং একটি আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইয়াং জেনারেশনকে লিডারশিপের প্রতি উদগ্রীব থাকতে হবে। সমাজের বুক থেকে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা, অশ্লীলতা, বিজাতীয় মতবাদসহ সকল অনাচার দূরভীত করে বাসযোগ্য সুন্দর পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে একদল ইয়াং জানবাজ প্রয়োজন যাঁরা অমীয় সুধা পানের লক্ষ্যে খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মত নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতেও পিছপা হবে না। মৃত্যু অবধি বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন থাকবে। খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু কে যখন ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয় তখন তিনি বলেছিলেন -

فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كـان لله مـصرعى
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال سلو ممزع.

'যেহেতু আমি মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার কোনো ভয় নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যেকোনো পার্শ্বে আমি ঢলে পড়ি। আমি যেহেতু আল্লাহর পথে মৃত্যু বরণ করছি, তাই ইচ্ছা করলে আল্লাহ আমার প্রত্যেকটি অঙ্গের বরকত দান করতে পারেন।[১০৯]

তাই পরিশেষে বলতে চাই, আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির লক্ষ্যে ইয়াং জেনারেশনকে খনিজ সম্পদের মতে কাজে লাগানো একান্ত জরুরি। অন্যান্য খাতে যেমনভাবে সরকার বাজেট বিনিয়োগ করে ঠিক তেমনিভাবে ইয়াং জেনারেশনকে যোগ্য নেতৃত্বের রূপকার হিসেবে গড়ে তোলার আশা করছি।

---

[১০৭] মুসনাদে আহমাদ , তিরমিযী হা : ২৮৬৩।
[১০৮] সুনানে দারেমী।
[১০৯] সহীহ বুখারী হা : ৩৯৮৯।

আদম আলায়হিস সালাম ও মানব ইতিহাসের সূচনা

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

নবী ও প্রথম মানব আদম আলায়হিস সালাম-এর কাহিনী ইসলামী ইতিহাসের আদি ভিত্তি, যা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মর্যাদা এবং পৃথিবীতে মানুষের আগমনকে ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে, বর্তমান বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ইতিহাস (বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব ও নৃবিজ্ঞান) মানবজাতির উৎপত্তিকে ভূ-প্রাকৃতিক পরিবর্তন, বিবর্তন এবং ক্রমান্বয়ে ঘটা সাংস্কৃতিক রূপান্তরের মাধ্যমে দেখে। ইসলামী ইতিহাস এবং আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসের এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে তুলনামূলক আলোচনা, তা নিচে কয়েকটি প্রধান বিষয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো :

১. মানবজাতির সূচনা ও উৎপত্তি : ইসলামী ইতিহাস: মানবজাতির সূচনা আকস্মিক এবং অলৌকিক। আল্লাহ তা'আলা কাদা মাটি দিয়ে প্রথম মানুষ হযরত আদম আলায়হিস সালাম-কে নিখুঁত অবয়বে সৃষ্টি করেন, তাঁর ভেতরে রূহ (আত্মা) ফুঁকে দেন এবং তাঁকে বিশেষ জ্ঞান (সবকিছুর নাম) দান করেন। তিনি জান্নাতে ছিলেন এবং পরবর্তীতে এক ভুলের পর তাঁকে ও বিবি হাওয়াকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। সমস্ত মানুষ এই এক আদি পিতা-মাতার সন্তান। যেমন মহান 'রাব্বুল আলামীন' বলেন,

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

'আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে একজন খলীফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করছি'। তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা আপনার প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি'। তিনি বললেন, 'নিশ্চয় আমি যা জানি, তোমরা তা জান না'।

﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

আর তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাকে এগুলোর নাম জানিয়ে দাও'।

قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

তারা বলল, 'আপনি পবিত্র ও মহান! আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।

﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ

তিনি বললেন, 'হে আদম, তুমি তাদের এগুলোর নাম জানিয়ে দাও'। অতঃপর যখন সে তাদের এগুলোর নাম জানিয়ে দিল, তখন তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান ও জমিনের গায়েবী বিষয় জানি এবং তোমরা যা প্রকাশ কর আর যা গোপন করতে, তাও আমি জানি?'[১১০]
অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾

স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি কাদা মাটি থেকে একজন মানুষ সৃষ্টি করছি'।

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾

'অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম ও নিখুঁত অবয়ব দেব এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সেজদাবনত হয়ে পড়ো।[১১১]

বিশ্ব ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মতে, মানবজাতির (Homo sapiens) উৎপত্তি হয়েছে এক দীর্ঘ বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, আনুমানিক ৩ লক্ষ বছর আগে পূর্ব আফ্রিকায়। বিজ্ঞান অলৌকিক সৃষ্টিতত্ত্বের বদলে ক্রমান্বয়ে ঘটা জিনগত রূপান্তর এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আদিম শিম্পাঞ্জি-সদৃশ পূর্বপুরুষ থেকে মানুষের বিকাশকে স্বীকার করে।

(ড. ইউভাল নোয়াহ হারারি, Sapiens: A Brief History of Humankind,)[১১২]

২. বুদ্ধিমত্তা, ভাষা ও জ্ঞান : ইসলামী ইতিহাসে আদম আলায়হিস সালাম পৃথিবীতে এসেছিলেন পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা, ভাষা এবং উন্নত জ্ঞান নিয়ে। আল্লাহ তাঁকে ভাষা এবং বিভিন্ন বস্তুর নামকরণ শিখিয়েছিলেন। অর্থাৎ, মানুষ প্রথম দিন থেকেই কথা বলতে

* মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

[১১০] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৩০-৩৩।
[১১১] সূরা সোয়াদ আয়াত : ৭১-৭২।
[১১২] স্যাপিয়েন্স : মানবজাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ৪-১১।

পারত, চিন্তা করতে পারত এবং আল্লাহর তাওহীদের জ্ঞান রাখত। যা পূর্বের দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

আধুনিক বিশ্ব ইতিহাস অনুযায়ী, আদিম মানুষের ভাষা ও বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের ছিল। ইশারা-ইঙ্গিত এবং বিভিন্ন আওয়াজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ক্রমান্বয়ে ভাষা (Language) এবং জটিল চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটেছে, যাকে বিজ্ঞানীরা আনুমানিক ৭০ হাজার বছর আগের 'জ্ঞানীয় বিপ্লব' (Cognitive Revolution) বলে থাকেন।[১১৩]

৩. জীবনধারা ও প্রযুক্তি (কৃষি ও সমাজ) : আদম (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর সন্তানদের (হাবিল ও কাবিল) কাহিনীতে আমরা সরাসরি উন্নত সমাজব্যবস্থার উপাদান দেখি। তাঁরা কৃষিকাজ করতেন (কাবিল) এবং পশুপালন করতেন (হাবিল)। অর্থাৎ, মানব ইতিহাসের একেবারে শুরুতেই উৎপাদনমুখী অর্থনীতি ও স্থায়ী সমাজ ছিল।

(ইমাম ইবনে জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক (ইতিহাসে তারীখে তাবারী নামে পরিচিত)[১১৪]

মহান রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾

আর তুমি তাদের কাছে আদমের দুই পুত্রের সংবাদ সত্যসহ পাঠ করো, যখন তারা উভয়ে কোরবানি (উৎসর্গ) করেছিল, অতঃপর তাদের একজনের থেকে কবুল করা হলো এবং অন্যজনের থেকে কবুল করা হলো না। সে (কাবিল) বলল, 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব'। অন্যজন (হাবিল) বলল, 'আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকীদের (সংযমীদের) পক্ষ থেকেই কবুল করেন'।

﴿لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾

'যদি তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হাত বাড়াব না; নিশ্চয় আমি বিশ্বজগতের রব আল্লাহকে ভয় করি'।

إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ 'নিশ্চয় আমি চাই যে, তুমি আমার (হত্যার) পাপ এবং তোমার (আগের) পাপের বোঝা নিজের ঘাড়ে নাও, ফলে তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হও; আর এটাই জালিমদের প্রতিফল'।[১১৫]

বিশ্ব ইতিহাসে প্রত্নতত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ তার ইতিহাসের সিংহভাগ সময় (প্রায় ৯৫%) যাযাবর ও শিকারী-সংগ্রাহক (Hunter-gatherer) হিসেবে কাটিয়েছে। তারা বনের ফলমূল খুঁজত এবং পশুপাখি শিকার করত। আজ থেকে মাত্র ১০,০০০-১২,০০০ বছর আগে 'কৃষি বিপ্লব' বা নব্যপ্রস্তর যুগে মানুষ প্রথম চাষাবাদ ও পশুপালন শেখে।

(জ্যারেড ডায়মন্ড, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (গানস, জার্মস, অ্যান্ড স্টিল: দ্য ফেটস অব হিউম্যান সোসাইটিজ), পৃষ্ঠা : ৮৫-৯২ এবং ১৩১-১৪০, ১৯৯৭ সালে ডব্লিউ. ডব্লিউ. নর্টন অ্যান্ড কোম্পানি থেকে প্রকাশিত)।

৪. ধর্মের উৎপত্তি ও বিশ্বাস : মানব ইতিহাসের প্রথম ধর্মই ছিল ইসলাম তথা তাওহীদী একত্ব (Monotheism) বিশ্বাসের ওপর। আদম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন প্রথম মুসলিম এবং আল্লাহর নবী। তাঁর সন্তানেরা এক আল্লাহর ইবাদত করত। পরবর্তীতে মানুষ সত্য পথ ভুলে গেলে যুগে যুগে অন্য দেব-দেবীর পূজা বা শিরক শুরু করে এবং তা সংশোধনের জন্য নতুন নবী পাঠানো হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে, শুরুতে সব মানুষ একই উম্মত বা একই দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে তারা শিরক ও কুফরের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ 'মানুষ সমাজ ছিল একই উম্মত (একই দ্বীন বা তাওহীদের ওপর)। অতঃপর (তারা যখন মতভেদ লিপ্ত হলো, তখন) আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে নবীগণকে পাঠালেন।'[১১৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন :

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾

'আর মানুষ তো ছিল একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, পরে তারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে।'[১১৭]

আধুনিক সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মতে, ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে বহু ঈশ্বরবাদ (Polytheism) বা প্রকৃতি পূজার (Animism) মধ্য দিয়ে। আদিম মানুষ বজ্রপাত, সূর্য, আগুন ও ঝড়কে ভয় পেয়ে সেগুলোর পূজা শুরু করে। একত্ববাদের

---

[113] Sapiens: A Brief History of Humankind। অধ্যায় ২: "The Tree of Knowledge", পৃষ্ঠা : ২১-৩৫।

[১১৪] ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২০-১২৫, বৈরুত সংস্করণ।

[১১৫] সূরা আল-মায়েদা আয়াত : ২৭-২৯।

[১১৬] সূরা আল-বাকারা আয়াত : ২১৩।

[১১৭] সূরা ইউনুস আয়াত : ১৯

(Monotheism) ধারণা অনেক পরে, বিশেষ করে ব্রোঞ্জ যুগে বা তার কিছু আগে বিকশিত হয়।[১১৮]

বিখ্যাত তাফসীরবিদ ইমাম ইবনে কাসীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আলায়হিস সালাম) থেকে শুরু করে নূহ (আলায়হিস সালাম)-এর আমল পর্যন্ত ১০টি যুগ (১০০০ বছর) সমস্ত মানুষ খাঁটি তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর মানুষের মধ্যে প্রথম শিরক বা বহু-ঈশ্বরবাদ ছড়ালে আল্লাহ নূহ (আলায়হিস সালাম)-কে প্রথম রাসূল হিসেবে পাঠান।[১১৯]

আবু উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আদম (আলায়হিস সালাম) কি একজন নবী ছিলেন?' রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপোকথনকারী (পূর্ণাঙ্গ) নবী ছিলেন।'[১২০]

একজন নবী হিসেবে আদম (আলায়হিস সালাম)-এর একমাত্র কাজই ছিল তাঁর সন্তানদের আল্লাহর তাওহীদের শিক্ষা দেয়া। ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম সেরা আকর গ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' (১ম খণ্ড, হযরত আদম আ.-এর অধ্যায়)-এ হাফিজ ইবনে কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আলায়হিস সালাম) তাঁর সন্তানদের তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং কাবিল যখন হাবিলকে হত্যা করে, তখন তা কোনো ধর্মীয় মতভেদের কারণে ছিল না, বরং ব্যক্তিগত হিংসার কারণে ছিল। তখনও পৃথিবীতে শিরক বা বহু-ঈশ্বরবাদের জন্ম হয়নি।

পৃথিবীতে মানব ইতিহাসের প্রথম ধর্মই ছিল ইসলাম। অন্যদিকে রবার্ট রাইটের মতো আধুনিক বিজ্ঞান ও ইতিহাস লেখকেরা অলৌকিক বা ধর্মীয় ইতিহাস বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন, মানুষ প্রথম দিকে বন্য ছিল এবং ভয় থেকে প্রকৃতি পূজা শুরু করে, যা পরে বহু শত বছর পর বিবর্তিত হয়ে একত্ববাদে রূপ নেয়। তাই রবার্ট রাইটের বইয়ে তাওহীদের যে আলোচনা আছে, তা মূলত হিব্রু ও ইসরাইলি সভ্যতার (ইব্রাহিম (আলায়হিস সালাম), ইয়াকুব (আলায়হিস সালাম) ও মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর সময়কাল) বিবর্তনকে কেন্দ্র করে, আদম (আলায়হিস সালাম)-কে কেন্দ্র করে নয়। যা সম্পূর্ণ আসল ইতিহাসের বিকৃতি।

ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বৈজ্ঞানিক ইতিহাসকে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক মনে হলেও, অনেক আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানী এ দুটির মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় খোঁজার চেষ্টা করেছেন :

'মানুষ' শব্দের সংজ্ঞা : অনেক গবেষক মনে করেন, বিজ্ঞানের 'হোমো সেপিয়েন্স' (নৃবৈজ্ঞানিক মানুষ) আর কুরআনের 'বনী আদম' বা 'ইনসান' (আত্মিক ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ) এক নয়। পৃথিবীতে হয়তো মানুষের অবয়বে অন্য কোনো প্রজাতি (যেমন নিয়াণ্ডারথাল বা আদি হোমো সেপিয়েন্স) ছিল, কিন্তু আল্লাহ যখন তাদের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিয়ে আত্মিক ও নৈতিক জ্ঞান (রূহ) দান করলেন, তখনই তিনি 'আদম' বা প্রথম নৈতিক মানুষ ও নবী হলেন।

কৃষি বিপ্লব ও আদমের আগমণ: যদি আদম (আলায়হিস সালাম)-এর সময়কালকে আজ থেকে ১০-১২ হাজার বছর আগের 'কৃষি বিপ্লব'-এর সাথে মেলানো হয়, তবে বিশ্ব ইতিহাসের মেসোপটেমীয় অঞ্চলের কৃষির সূচনা এবং ইসলামী ইতিহাসের কাবিল-হাবিলের কৃষিকাজের বিবরণের মধ্যে চমৎকার মিল পাওয়া যায়।

মানব জাতির সূচনায় ইব্রাহীমীয় ধর্ম ও বিবর্তনবাদী দৃষ্টি: মানবজাতির উৎপত্তি মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক আলোচিত ও মৌলিক প্রশ্নগুলোর একটি। মানুষ কোথা থেকে এসেছে, কীভাবে তার সৃষ্টি হয়েছে এবং পৃথিবীতে তার আগমনের উদ্দেশ্য কী-এসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান দীর্ঘকাল ধরে নিজ নিজ ব্যাখ্যা প্রদান করে আসছে। আব্রাহামীয় ধর্মসমূহ-ইসলাম, ইহুদি ধর্ম ও খ্রিস্টধর্ম-মানব সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার প্রত্যক্ষ সৃজনকর্ম হিসেবে ব্যাখ্যা করে। অন্যদিকে আধুনিক জীববিজ্ঞানে বিবর্তনবাদ মানুষের উৎপত্তিকে দীর্ঘমেয়াদি জৈবিক পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের আলোকে ব্যাখ্যা করে। ফলে মানব সৃষ্টির বিষয়টি কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের নয়; এটি ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, দর্শন, জীববিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্বেরও একটি আন্তঃবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানবজাতির প্রথম পিতা হলেন আদম (আলায়হিস সালাম)। আল্লাহ তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন, তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন এবং তাঁকে জ্ঞান শিক্ষা দেন। এরপর আদম (আলায়হিস সালাম)-এর স্ত্রী হাওয়া (আলায়হিস সালাম)-কে সৃষ্টি করা হয় এবং তাঁদের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির বিস্তার ঘটে। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।"[১২১] অন্যত্র বলা হয়েছে, "যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ করব এবং তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে।"[১২২] ইসলামী বিশ্বাসে আদম (আলায়হিস সালাম) কেবল প্রথম মানুষ নন; তিনিই প্রথম নবী, প্রথম শিক্ষক এবং পৃথিবীতে

118 রবার্ট রাইট, The Evolution of God (ঈশ্বরের বিবর্তন), পৃষ্ঠা: ২৮

১১৯ তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা ইউনুসের ১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

১২০ সহীহ ইবনে হিব্বান, হা : ৬১৯০; মুসনাদে আহমাদ, হা : ২২২৮৮, হাদীসটি সহীহ ।

১২১ সূরা আল-মু'মিনূন আয়াত : ১২।

১২২ সূরা আল-হিজর আয়াত : ২৯।

আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা)। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যও কুরআনে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে-আল্লাহর ইবাদত এবং পৃথিবীতে ন্যায়ভিত্তিক জীবন প্রতিষ্ঠা।[১২৩]

ইহুদি ধর্ম মতে, মানব সৃষ্টির ইতিহাস শুরু হয় ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে। ইহুদিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের (তোরাহ) প্রথম গ্রন্থ জেনেসিস (Genesis)-এ বর্ণিত হয়েছে যে, ঈশ্বর ছয় দিনের সৃষ্টিকর্মের শেষ পর্যায়ে মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেখানে মানুষকে ঈশ্বরের 'প্রতিমূর্তিতে' (Image of God) সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। ইহুদি ধর্মতত্ত্বে এর অর্থ মানুষ ঈশ্বরের শারীরিক প্রতিরূপ নয়; বরং জ্ঞান, নৈতিক বিচারক্ষমতা, স্বাধীন ইচ্ছা এবং দায়িত্বশীলতার অধিকারী এক বিশেষ সৃষ্টি। এ ধারণাই ইহুদি ধর্মে মানবমর্যাদা ও নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।[১২৪]

জেনেসিসের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানব সৃষ্টির আরো বিশদ বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মাটির ধূলি থেকে আদমকে গঠন করেন এবং তাঁর নাসারন্ধ্রে জীবনশ্বাস প্রদান করেন। ফলে আদম জীবন্ত সত্তায় পরিণত হন। ইহুদি ব্যাখ্যায় 'ধূলি' মানুষের বিনয়, নশ্বরতা এবং পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রতীক; আর ঈশ্বরপ্রদত্ত জীবনশ্বাস মানুষের আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও নৈতিক দায়িত্বের প্রতীক। এই দ্বৈত পরিচয়-পার্থিব ও আধ্যাত্মিক-মানব প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত।[১২৫]

এরপর ঈশ্বর আদমের জন্য হাওয়াকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁদের এডেন উদ্যানে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। ইহুদি ধর্মে এ ঘটনাকে মানব পরিবারের সূচনা এবং বিবাহ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়। একই সঙ্গে এডেন উদ্যানে নিষিদ্ধ বৃক্ষের আদেশ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, আনুগত্য এবং নৈতিক পরীক্ষার প্রতীক। আদম ও হাওয়ার অবাধ্যতার ফলে তাঁরা উদ্যান ত্যাগ করেন, কিন্তু ইহুদি ধর্মে এই ঘটনাকে সমগ্র মানবজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত 'আদি পাপ' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয় না; বরং প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী-এটাই ইহুদি নৈতিকতার মূল শিক্ষা।[১২৬]

খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী, মানবজাতির সৃষ্টির ইতিহাস ও তার উদ্দেশ্য ওল্ড টেস্টামেন্টের 'বুক অব জেনেসিস' বা 'আদিপুস্তক'-এর ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তিনি তাকে সৃষ্টি করলেন; পুরুষ ও নারী করে তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন। খ্রিস্টধর্মে এই 'ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বা 'ইমাগো দেই' (Imago Dei) ধারণাটির অর্থ হলো মানুষকে ঈশ্বরের নৈতিক গুণাবলি, যেমন-প্রেম, পবিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, বুদ্ধিমত্তা এবং স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করার পর তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং পৃথিবীতে বংশবৃদ্ধি করে সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর কর্তৃত্ব ও দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধানের অধিকার অর্পণ করলেন।[১২৭]

প্রভু ঈশ্বর ভূমির ধূলি দিয়ে মানুষকে গঠন করলেন এবং তার নাসারন্ধ্রে জীবন-শ্বাস ফুঁকে দিলেন; তাতে মানুষ জীবন্ত প্রাণী হয়ে উঠল। খ্রিস্টীয় ব্যাখ্যায় এটি দেখায় যে মানুষের একটি দ্বৈত সত্তা রয়েছে-সে একদিকে মাটির ধূলির মতো নশ্বর ও পার্থিব, অন্যদিকে ঈশ্বরের দেওয়া জীবন-শ্বাসের কারণে আধ্যাত্মিক ও অমর আত্মার অধিকারী। এরপর ঈশ্বর আদমের পাঁজরের হাড় থেকে প্রথম নারী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন, যা খ্রিস্টধর্মে মানব পরিবারের সূচনা এবং পবিত্র বিবাহের ঐশ্বরিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়।[১২৮]

আদম ও হাওয়ার নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অবাধ্যতাকে খ্রিস্টধর্মে কেবল একটি ভুল হিসেবে দেখা হয় না, একে 'আদি পাপ' (Original Sin) বা 'মানবজাতির পতন' (The Fall) বলা হয়। সেন্ট অগাস্টিনের মতো আদি চার্চের প্রধান ধর্মতাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, আদমের এই প্রথম পাপের ফলে মানব প্রকৃতির আদি নিষ্পাপ অবস্থা কলঙ্কিত হয় এবং সেই পাপের প্রবণতা ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু উত্তরাধিকারসূত্রে সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। যেমন এক জন মানুষ দ্বারা পাপ জগতে প্রবেশ করিল, এবং পাপ দ্বারা মৃত্যু প্রবেশ করিল; আর এই প্রকারে মৃত্যু সর্ব্বমানুষে ব্যাপিল, কেননা সকলেই পাপ করিল।[১২৯]

এ আদি পাপের ধারণাই খ্রিস্টধর্মের মূল ভিত্তি অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে পরিত্রাণ বা মুক্তির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেয়। মানুষ যেহেতু নিজের চেষ্টায় এ পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারছিল না, তাই ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশু খ্রিস্টকে পৃথিবীতে পাঠান, যিনি ক্রুশের ওপর নিজের জীবন উৎসর্গ করে মানবজাতির

[১২৩] সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত : ৫৬; সূরা আল-বাকারা আয়াত : ৩০।

[১২৪] বুক অব জেনেসিস, ১:২৬-২৮, দ্য জিউইশ স্টাডি বাইবেল, সম্পাদক: অ্যাডেল বার্লিন ও মার্ক জভি ব্রেটলার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪, জেনেসিস-এর ব্যাখ্যা অংশ

[১২৫] বুক অব জেনেসিস, ২:৭। দ্য জিউইশ স্টাডি বাইবেল, জেনেসিস ২-এর ব্যাখ্যা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪.।

[১২৬] বুক অব জেনেসিস, ২:২১-২৫; ৩:১-২৪,দ্য জিউইশ স্টাডি বাইবেল, জেনেসিস ৩-এর ব্যাখ্যা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪।

[১২৭] আদিপুস্তক ১:২৭-২৮ (পবিত্র বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্ট সংস্করণ)

[১২৮] আদিপুস্তক ২:৭, ২১-২২ (পবিত্র বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্ট সংস্করণ)।

[১২৯] রোমীয় ৫:১২ (পবিত্র বাইবেল, নিউ টেস্টামেন্ট সংস্করণ)]।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। কারণ আদম যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে সজীব করা যাইবে। অর্থাৎ, প্রথম আদমের মাধ্যমে মানবজাতি যেখানে পাপে পতিত হয়েছিল, দ্বিতীয় আদম বা যীশু খ্রিস্টের মাধ্যমে মানুষ পুনরায় ঈশ্বরের সান্নিধ্য এবং অনন্ত জীবন লাভ করে।[১৩০]

আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকেও মানবজাতির সূচনা ও উৎপত্তি নিয়ে বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী।

চার্লস ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ কোনো অলৌকিক উপায়ে হঠাৎ পৃথিবীতে আসেনি; বরং কোটি কোটি বছর ধরে চলা একটি ধীর এবং ধারাবাহিক প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্য জীব থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে। প্রকৃতির টিকে থাকার লড়াইয়ে যেসব জীব পরিবেশের সাথে সবচেয়ে ভালো খাপ খাওয়াতে পারে, তারাই টিকে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে- যাকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection) বলা হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম কাজ করেছে এবং মানুষ ও আধুনিক বানরজাতীয় প্রাণীরা কোটি কোটি বছর আগে একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ (Common Ancestor) থেকে আলাদা হয়ে ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিকশিত হয়েছে।[১৩১]

নৃতত্ত্ব ও জীবাশ্ম বিজ্ঞান মাটির নিচ থেকে মানুষের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের অসংখ্য হাড় ও খুলির জীবাশ্ম বা ফসিল আবিষ্কার করেছে, যা বিবর্তনের এই ধারাকে সরাসরি প্রমাণ করে। যেমন-আজ থেকে প্রায় ৩২ লক্ষ বছর আগের দ্বিপদী (দুই পায়ে হাঁটা) পূর্বপুরুষ 'লুসি' বা 'অস্ট্রালোপিথেকাস' (Australopithecus)-এর কঙ্কাল। এই ফসিলগুলোর গঠন পরীক্ষা করলে দেখা যায় কীভাবে সময়ের সাথে সাথে প্রাচীন হোমিনিনদের মস্তিস্কের আকার বড় হয়েছে এবং তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে শিখেছে।[১৩২]

আধুনিক জিনতত্ত্ব বা ডিএনএ (DNA) প্রযুক্তির আবিষ্কার বিবর্তনবাদকে আরো শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের জিনোম (Genome) বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, মানুষের ডিএনএ-র বিন্যাস ও ক্রোমোজোমের কাঠামোর সাথে শিম্পাঞ্জির ডিএনএ-র প্রায় ৯৮.৮% মিল রয়েছে। এই আণবিক মিল প্রমাণ করে যে, জিনগত স্তরেও মানুষ প্রকৃতির অন্য সব প্রাণীর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত এবং একটি সাধারণ উৎস থেকেই মানুষের জিনের এই রূপান্তর বা মিউটেশন ঘটেছে।[১৩৩]

এ বিবর্তন প্রক্রিয়ার সর্বশেষ এবং সবচেয়ে উন্নত ধাপ হলো আধুনিক মানুষ বা 'হোমো স্যাপিয়েন্স' (Homo sapiens), যাদের উৎপত্তি আনুমানিক ৩ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকায় হয়েছিল। সেখান থেকে তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে 'জ্ঞানীয় বিপ্লব' (Cognitive Revolution)-এর মাধ্যমে ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে আজকের মানব সভ্যতা গড়ে তোলে। অর্থাৎ, বিবর্তনবাদী দৃষ্টিতে মানুষ প্রকৃতির কোনো বিচ্ছিন্ন বা বিশেষ সৃষ্টি নয়, বরং সে প্রকৃতিরই এক দীর্ঘ ও জটিল জৈবিক প্রক্রিয়ার ফল।[১৩৪]

মানবজাতি কোনো পূর্ববর্তী প্রাণী থেকে ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হয়ে আসেনি। আল্লাহ তা'আলা প্রথম মানুষ আদম আলায়হিস সালাম-কে সরাসরি মাটি থেকে একটি বিশেষ ও অলৌকিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, যা সূরা আল-মু'মিনূন (২৩:১২) এবং সূরা আল-হিজর (১৫:২৯)-এর আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। অন্যদিকে, চার্লস ডারউইনের The Descent of Man (১৮৭১, খণ্ড ১, অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ৯-৩১) গ্রন্থে দাবি করা হয় যে, মানুষ ও অন্যান্য প্রাইমেটরা একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এসেছে। খ্রিস্টধর্মেও ওল্ড টেস্টামেন্টের জেনেসিস অনুযায়ী সৃষ্টির বিবরণ প্রায় একই, তবে সেখানে রোমীয় ৫:১২ পদের সূত্র ধরে 'আদি পাপ'-এর ওপর জোর দেয়া হয়, যা ইসলাম সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। ইসলাম মনে করে, প্রতিটি মানুষ জন্মগতভাবে নিষ্পাপ। আধুনিক জিনতত্ত্বে ফ্রান্সিস কলিন্সের The Language of God (২০০৬, অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ১২১-১৪৪) গ্রন্থে মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জির ডিএনএ-র যে গভীর মিলের কথা বলা হয়েছে, ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাকে সাধারণ পূর্বপুরুষের প্রমাণ না মেনে বরং একই সৃষ্টিকর্তার 'সাধারণ নকশা' বা কমন ডিজাইন হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। সংক্ষেপে, বিজ্ঞান যেখানে মানুষকে কেবল একটি উন্নত প্রাণী হিসেবে দেখে, ইসলাম সেখানে মানুষকে আল্লাহর সরাসরি সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে তাঁর বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে এক সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা দেয়।

---

[১৩০] করিন্থীয় ১৫:২২ (পবিত্র বাইবেল, নিউ টেস্টামেন্ট সংস্করণ।

[১৩১] চার্লস ডারউইন, On the Origin of Species (১ম সংস্করণ, ১৮৫৯), পৃষ্ঠা ৮০।

[১৩২] ডোনাল্ড জোহানসন ও মেটল্যান্ড এডি Lucy: The Beginnings of Humankind (Simon & Schuster সংস্করণ, tragedy/reprint ১৯৮১) পৃষ্ঠা ১৫১।

[১৩৩] ফ্রান্সিস কলিন্স,The Language of God (Free Press সংস্করণ, ২০০৬) পৃষ্ঠা ১২১

[১৩৪] ইউভাল নোয়াহ হারারি (Yuval Noah Harari) Sapiens: A Brief History of Humankind (Harper Collins ইংরেজি সংস্করণ, ২০১৪), পৃষ্ঠা ৩।

ফাতাওয়া ও মাসায়েল | الفتاوى والمسائل

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন (১) বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখা কি জায়েয? দয়া করে জানাবেন।

উসমান, রাজশাহী

উত্তর : বিশ্বকাপ ফুটবল এখন কেবল একটি খেলার আসর নয় বরং এটি আন্তর্জাতিক জুয়া, নগ্নতা এবং নানামুখী অনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। ইসলাম শরীরচর্চা ও হালাল পন্থায় বিনোদনকে নিরুৎসাহিত করে না; বরং সালাত ও ফরজ ইবাদতের ক্ষতি না হওয়া এবং শরয়ি সীমার মধ্যে থাকা সাপেক্ষে সাময়িক খেলাধুলা জায়েয। কিন্তু বর্তমান বিশ্বকাপ আয়োজনগুলোতে যে ধরনের বেহায়াপনা ও হারাম কর্মকাণ্ডের সয়লাব ঘটে তা কোনোভাবেই একজন মুসলিমের আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিজ্ঞ আলেমগণ এ কারণে বিশ্বকাপ দেখা, এর জার্সি কেনা বা ব্যবহার করা এবং এই আয়োজনে কোনোভাবে সম্পৃক্ত থাকাকে নাজায়েয বা হারাম বলেছেন। একজন সচেতন মুসলিম হিসেবে এই সব হারামের বিশ্ব আসর থেকে নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে রাখা এবং নিজের ঈমানি সত্তাকে হেফাযত করাই ঈমানের দাবি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং দ্বীনের ওপর অটল থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

প্রশ্ন (২) ইন্ডিয়াতে বেশ কিছু অঞ্চলে গরু কুরবানী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইন্ডিয়ার সরকারের আইন অমান্য করে গরু কুরবানী করা কিংবা গরু যবেহ করা বৈধ হবে?

হামজা মোল্লা, চট্টগ্রাম

উত্তর : ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন ও বিধান মানা জায়েজ নাই। সুতরাং ভারতের মত চরম ইসলামবিদ্বেষী কাফের শাসক যদি মুসলিমদেরকে গরু কুরবানি করতে বারণ করে তাহলে তা মান্য করা জরুরি নয়। সুতরাং নিজের নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে গোপনে গরু কুরবানি করতে কোনো বাধা নেই। তবে যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। সে ক্ষেত্রে যেহেতু আরো বিকল্প পদ্ধতি আছে (যেমন : ছাগল, দুম্বা, উট ইত্যাদি) তাই সেগুলো দ্বারা কুরবানি করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, সম্ভবত গরু কুরবানি করা ভারতে পরিপূর্ণ নিষেধ নয়। বিশেষ ছাড়পত্র নিয়ে শর্ত সাপেক্ষে তা করার অনুমতি আছে। যদি সম্ভব হয় তাহলে সেটাও চেষ্টা করা যেতে পারে। না হলে বিকল্প পথে যাওয়া উচিত। আল্লাহু আলাম।

প্রশ্ন (৩) : আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে 'লেগেছে' শব্দটি ব্যবহার করা কি সঠিক? যেমন, 'পৃথিবী সৃষ্টি করতে ছয় দিন লেগেছে' বলা যাবে, নাকি 'আল্লাহ ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন' বলা উচিত?

লুৎফুর রহমান, লক্ষীপুর

উত্তর : আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করতে আল্লাহ তা'আলার ছয় দিন লেগেছে, -আল্লাহর শানে এভাবে কথাটি বলা ঠিক নয় বলেই মনে করি। কারণ কথাটি ধারণা দেয় যে, আল্লাহ কষ্ট করে আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন। ছয়দিনের কমে তাঁর পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না (নাউযুবিল্লাহ)। বরং আল্লাহ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে কেবল বলেন, হয়ে যাও। সাথে সাথে তা হয়ে যায়। অতএব এ বিষয়ে সঠিক কথা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ হিকমতের কারণে ছয়দিনে আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্ন (৪) ইসলামে নারীর পর্দার হুকুম কী? দয়া করে জানাবেন।

আ: ওয়াহিদ, ঝিনাইদহ

উত্তর : গায়রে মাহরাম পুরুষদের উপস্থিতিতে একজন মহিলার জন্য হিজাব পরিধান করা ফরয। কারণ মহিলা

ফিতনার কারণ হয়ে থাকে এবং তাঁর দিকে তাকানোও ফিতনার কারণ। সুতরাং নিজে ফিতনায় পতিত হওয়া থেকে এবং অন্যদেরকে ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে অবশ্যই হিজাব পরতে হবে। মহান আল্লাহ নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের সম্পর্কে এবং অন্যান্য নারীদের সম্পর্কে বলেছেন,

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.﴾

“আর যখন তোমরা তাদের কাছে কিছু চাও, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিক পবিত্র।”[১]

হিজাব হলো জিলবাব বা এমন কোনো পোশাক যা মুখসহ পুরো শরীর ঢেকে রাখে। মুখমণ্ডল হলো সৌন্দর্যের স্থান। তাই এটি আবৃত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার উচিত তার মাথা, মুখ এবং শরীরের বাকি অংশ আবৃত রাখা। চারপাশ দেখার জন্য অথবা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আদান-প্রদান করার জন্য একটি বা দুটি চোখ খোলা রাখলে কোনো আপত্তি নেই। উপসংহার হলো, যারা মাহরাম নয়, তাদের সামনে একজন নারীর জন্য হিজাব আবশ্যক। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾

“হে নবী, তোমার স্ত্রীগণ, তোমার কন্যাগণ এবং মুমিন নারীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের আবরণ নিজেদের গায়ে জড়িয়ে নেয়। এটাই অধিকতর শোভন, যাতে তাদের চেনা যায় এবং তারা হয়রানির শিকার না হয়।[২] জিলবাব হলো এমন একটি পোশাক যা একজন নারী অতিরিক্ত আবরণ ও আড়াল হিসেবে তার মাথা ও শরীরের ওপর জড়িয়ে নেয়।

শুধুমাত্র জিলবাবই মূল বিষয় নয়; মূল কথা হলো, কী তাকে আবৃত করে এবং বিপদ ও প্রলোভন থেকে রক্ষা করে। যদি জিলবাব, যা একটি ঢিলেঢালা পোশাক, পাওয়া যায়, তবে তার উচিত তা পরিধান করা এবং তা দিয়ে তার মুখ ও শরীর ঢেকে রাখা। বর্তমানে ঢিলেঢালা বোরকা জিলবাবের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তবে বিভিন্ন ডিজাইনের বোরকা, যা পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, তা বর্জন করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৫) : টেস্ট টিউবের মাধ্যমে সন্তান নেওয়া সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী? দয়া করে জানাবেন।

শিহাব আলী, যশোর

উত্তর : এ বিষয়টি বিশদ ব্যাখ্যার দাবি রাখে এবং মক্কায় ইসলামী ফিকাহ একাডেমী পরিষদের সদস্যরা এক অধিবেশনে এটি নিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। তারা এর বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। এসব পদ্ধতি থেকে তারা শুধু একটি পদ্ধতিকে অনুমোদন দিয়েছেন এবং বাকী পদ্ধতি সর্বসম্মতভাবে হারাম বলে গণ্য করেছেন। পরিষদ কর্তৃক বৈধ শ্রেণীটি প্রযোজ্য হয় যখন কোনো নারী তার রোগের কারণে গর্ভধারণে অক্ষম হয় অথবা যখন তার স্বামী অন্তর্নিহিত শারীরিক সমস্যায় ভোগে এবং তাঁর স্ত্রীর গর্ভাশয়ে শুক্রানু প্রবেশ করাতে অক্ষম হয়, তখন এই ধরনের ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে যদি স্বামীর কাছ থেকে শুক্রাণু সংগ্রহ করে স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে এট জায়েয আছে। এ ছাড়া আর কোনো পদ্ধতি ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত নয়।

প্রশ্ন (৬) : কোনো কোনো বক্তা সূর দিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে গানের সুরে ওয়ায করে থাকেন। এটা কি জায়েয?

মাহদী হাসান, ফরিদপুর

উত্তর : ইসলামী আলোচনা বা ওয়াযের ভাষা সাধারণ কথা-বার্তার মতো হওয়া আবশ্যক। জুম‘আর খুতবা কিংবা ওয়াজ-নসীহতের সময় কথার স্বাভাবিক অবস্থা পাল্টানো নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের তরীকার পরিপন্থী। সুতরাং সুর দিয়ে ওয়াজ করা সালাফদের তরীকার বাইরে। গানের সূরে বক্তব্য দেয়া হলে সেটা আরো কঠিনভাবে নিষিদ্ধ হবে। বক্তব্যের উদ্দেশ্য হবে

---

[১] সূরা আহযাব আয়াত : ৫৩।
[২] সূরা-আহযাব আয়াত : ৫৯।

মানুষকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা ও জাহান্নাম থেকে ভয় দেখানো। আল্লাহ বলেন,

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

“তোমরা মানুষকে ডাক তোমাদের প্রভুর রাস্তায় প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে”...।[৩] রাসূল ﷺ যখন জুম'আর খুৎবা দিতেন, তখন তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে যেত। তাঁর কণ্ঠ উঁচু হ'ত এবং তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত। যেন তিনি সেনাবাহিনীকে কোন নির্দেশ দিচ্ছেন'[৪] সূর দিয়ে বক্তব্য দিলে মানুষ সূর শুনবে। কিন্তু কোনো উপদেশ গ্রহণ করবে না। অবশ্য কুরআনের আয়াতসমূহ সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করা ভালো।

প্রশ্ন (৭) : শিয়াদের কিছু প্রসিদ্ধ আকীদাহ সম্পর্কে জানতে চাই। দয়া করে জানাবেন।

ইসহাক, ময়মনসিং।

উত্তর : শিয়া সম্প্রদায়ের আকীদা বা বিশ্বাসের ভিত্তি আহলে সুন্নাত থেকে বেশ ভিন্ন। শিয়ারা প্রধানত তিনটি উপদলে বিভক্ত (১) ইসনা আশারিয়া বা দ্বাদশবাদী, (২) ইসমাঈলী এবং (৩) জায়েদী। নিচে তাদের সবচেয়ে বড় দল 'ইসনা আশারিয়া' (দ্বাদশবাদী)-এর কিছু প্রসিদ্ধ ও মৌলিক আকীদা তুলে ধরা হলো :

১) **ইমামত ও খেলাফতের ধারণা** : শিয়াদের মূল ভিত্তি হলো ইমামাত। তাদের বিশ্বাস, নবী ﷺ-এর প্রথম খলীফা হলেন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি রাসূল ﷺ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত ছিলেন; কিন্তু আবু বকর, উমার এবং উসমান তাকে খেলাফত থেকে বঞ্চিত করেছেন। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল। রাসূল ﷺ কাউকে খলীফা নির্বাচিত করে যাননি। সাহাবীদের পরামর্শ ও বাই'আতের মাধ্যমে খলীফা আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হয়েছেন। এমনকি আলীও আবু বকরের হাতে খেলাফতের বাই'আত করেছেন।

২) **গায়েবী ইমাম** : শিয়াদের বিশ্বাস, দ্বাদশ ইমাম বা সর্বশেষ খলীফা মুহাম্মাদ আল-মাহদী জন্মগ্রহণ করার পর ২৬০ হিজরীতে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং সঠিক সময়ে আল্লাহর নির্দেশে 'মাহদী' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন।

৩) **প্রথম তিন খলীফার ব্যাপারে শিয়াদের আকীদাহ** : শিয়াদের একটি বড় অংশ প্রথম তিন খলিফা আবু বকর, উমর ও উসমান (আনহুম)-কে খেলাফতের হকদার মনে করে না। তারা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পরিবার ও বংশধরদের খেলাফত সীমাবদ্ধ রাখে।

৪) **সাহাবীদের ব্যাপারে আকীদাহ** : শিয়ারা মনে করে, মাত্র কয়েকজন যেমন আলী, মিকদাদ, সালমান, আম্মার আবু যার (আনহুম) গুটি কয়েকজন সাহাবী ব্যতীত বাকীরা রাসূল রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুর পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, (নাঊযুবিল্লাহ)।

৫) **কালিমা ও আযান** : শিয়াদের কালিমা ও আযানে মূল বাক্যের পাশাপাশি অতিরিক্ত হিসেবে 'আলিউন ওয়ালিউল্লাহ' (আলী আল্লাহর বন্ধু) বাক্যটি যুক্ত থাকে।

৬) **মাসুমিয়্যাত** : তাদের বিশ্বাস, নবী-রাসূলদের মতো ইমামগণও সকল প্রকার ভুল-ত্রুটি ও পাপ থেকে মুক্ত বা নিষ্পাপ।

৭) **তাকিয়া** : আত্মরক্ষার স্বার্থে বা বৈরী পরিবেশে নিজের প্রকৃত ধর্মীয় পরিচয় গোপন করা বা সত্য কথা এড়িয়ে যাওয়া শিয়া ধর্মে জায়েয হিসেবে স্বীকৃত।

৮) **আকীদাতুল বাদা** : ইসনা আশারীয়া শিয়া বা রাফেযীদের মতে আল্লাহ তা'আলার বাদা হয়। বাদা শব্দের অর্থ হলো লুকায়িত ও গোপন থাকার পর প্রকাশিত হওয়া, তাঁর ভুল হওয়ার পর সঠিক হওয়া, সিদ্ধান্ত ও মত পরিবর্তন করা ইত্যাদি। রাফেযীদের ঐক্যমতে আল্লাহ তা'আলা ভুল করেন, তাঁর দ্বারা ভুল হওয়া সম্ভব, (নাঊযুবিল্লাহ)। তারা মনে করে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে একটা সিদ্ধান্ত নেন। পরে এটা তাঁর কাছে ভুল প্রমাণিত হওয়ার কারণে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন, (নাউযবিল্লাহ)। তাদের আকীদাহ অনুসারে আল্লাহ তা'আলার জন্য জাহালাত বা মূর্খতা সাব্যস্ত হয়, (নাঊযুবিল্লাহহ)। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আকীদাহ। এদের কাফের হওয়ার জন্য এরকম একটি বিভ্রান্তিই যথেষ্ট।

---

[৩] সূরা আন নাহল আয়াত : ১২৫।
[৪] সহীহ মুসলিম হা : ২০৪২।

৯) **মুতা বিবাহ :** রাফেযীসহ শিয়াদের সকল ফির্কার মতেই মুতা (নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য) বিবাহ বৈধ। শুধু তাই নয়; বরং এটাকে তারা বিরাট বড় সাওয়াবের কাজ মনে করে।

১০) **আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দুআ করা :** শিয়াদের শাইখদের আকীদাহ অনুযায়ী আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা জায়েয। কোনো সন্দেহ নেই যে, এটাই ছিল জাহেলী যুগের মক্কাবাসীদের শির্ক। আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের শির্ক সম্পর্কে বলেন,

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

"যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে তারা বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না"।[৫]

এ বাতিল ফির্কার আরো অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে, যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ আমাদেরকে এদের বিভ্রান্তি থেকে হেফাযত করুন, আমীন।

৮) চুরি বা ছিন্তাই করা জিনিস ক্রয় করা যাবে কি?

উত্তর : জানার পর চোরাই জিনিস ক্রয় করা নিষিদ্ধ। না জেনে কেনা হয়ে গেলে সে কথা ভিন্ন। কেনার পর যদি জানা যায় যে, এটা চোরাই জিনিস এবং যার কাছ থেকে চুরি বা ছিনতাই করা হয়েছে, তাহলে প্রকৃত মালিকের কাছে জিনিসটি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"সাওয়াব ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো, পাপ এবং অন্যায়ের কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো না"।[৬]

[৫] সূরা আয-যুমার আয়াত : ৩।
[৬] সূরা আল-মায়েদা আয়াত : ২।

৩) বোরকা ছাড়া অন্য কাপড় দিয়ে কি নারীদের পর্দা পালন করা বৈধ হবে না?

উত্তর : বোরকা দিয়েই যে নারীদের পর্দা করতে হবে, বিষয়টা এমন নয়। ইসলামে নারীদের পর্দার জন্য শুধু বোরকা নির্দিষ্ট করে দেয়নি। বোরকা ছাড়াও পর্দা হ'তে পারে। তবে ঢিলে-ঢালা ও কালো বোরকা পর্দার জন্য সবচেয়ে সহায়ক পোষাক।

নারীদের পর্দার ক্ষেত্রে নিম্নের এই বিষয়গুলো মেনে চললেই হবে।

(১) হিজাব বা পর্দা যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর আবৃতকারী হয়। (২) এটি যেন ঘন বা মোটা কাপড়ের হয়, যার বাহির থেকে ভেতরের অংশ দেখা না যায়। (৩) পোষাকটি যেন আকর্ষণীয় সাজসজ্জা বা অলঙ্করণে জমকালো না হয়, যা পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (৪) সুগন্ধি মাখানো না হয়। (৫) এটি যেন লোক দেখানো বা সুখ্যাতি অর্জনের পোশাক না হয়। (৬) পুরুষদের পোশাকের সদৃশ্য বা অনুকরণে না হয়। (৭) এতে যেন কোন প্রাণীর ছবি বা প্রতিকৃতি না থাকে।[৭]

প্রশ্ন (৮) : সম্মানিত শাইখ! যেই মসজিদের ইমাম সৌদি আরবের শাসকদেরকে কাফের বলে অথবা হারামাইন শরীফাইনের আলেমদের সমালোচনা করে, তার পেছনে সালাত পড়া কি জায়েয?

সাঈদ বিন রশিদ, নেত্রকনা

উত্তর : যারা হারামাইন শরীফাইনের শাসকদেরকে কাফের বলে, তারা নিঃসন্দেহে বিদ'আতী। অনুরূপভাবে যারা হারামাইন শরীফাইনের আলেমদের সমালোচনা করে এবং তাদেরকে দোষারোপ করে, তারাও বিদ'আতী। তাদের পিছনে সালাত পড়া অন্যান্য বিদ'আতীদের পেছনে সালাত পড়ার মতোই। সম্ভব হলে এরকম ইমামকে পরিবর্তন করা আবশ্যক। তবে পরিবর্তন করা বা তাকে সরাতে গেলে যদি আরো বড় ফিতনার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার পেছনে সালাত পড়া জায়েয আছে। তবে আপনি যা বলছেন, তা আগে

[৭] ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/১৪০।

সূচিপত্র

প্রমাণ করতে হবে। শুধু অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে কোনো হুকুম প্রয়োগ করা যাবে না।

প্রশ্ন (৯) : জনৈক আলেম বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর যেকোন একজন সালাত আদায় না করলে বা অনিয়মিতভাবে আদায় না করলেও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। উক্ত কথা সঠিক কি?

আহনাফ, গাইবান্ধা।

উত্তর : এই ফতোয়া সঠিক নয়। বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার জন্য তালাক দেওয়া শর্ত। তালাক না দিলে তালাক হবে না। তবে তাদের কেউ যদি সালাতের ফরযিয়াত অস্বীকার করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যার ফলে বৈবাহিক সম্পর্ক সাময়িকভাবে স্থগিত হবে।[৮]

প্রশ্ন (১০) : স্বামী-স্ত্রীর যে কোনো একজন মারা গেলে তাদের জীবিতজন কি মৃতজনকে গোসল দিতে পারবে? ইসলামী শরীয়ত এ বিষয়ে কী বলে, দয়া করে জানাবেন।

ইহসান, বাগেরহাট।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর একজন মৃত্যুবরণ করলে অন্যজন তার গোসল করাতে পারবেন কি না, এ প্রশ্ন অনেকের মনেই আসে। বিশেষ করে মৃত স্বামীকে তার স্ত্রী কিংবা মৃত স্ত্রীকে তার স্বামী গোসল করানোর বিধান সম্পর্কে ফিকহবিদদের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। কুরআন, হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের আলোকে এ বিষয়ে কী নির্দেশনা পাওয়া যায়, তা জানা দরকার। মৃত স্বামীকে কি তার স্ত্রী গোসল করাতে পারবেন- এমন প্রশ্নে অধিকাংশ আলেমের মত হলো, স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাকে গোসল করাতে পারেন।

এর কারণ হলো, স্বামীর মৃত্যুর পরও স্ত্রী ইদ্দত পালন করেন এবং এই সময় পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্কের কিছু বিধান বহাল থাকে। তাই তিনি স্বামীর মুখ দেখতে, তাকে স্পর্শ করতে এবং প্রয়োজনীয় শরয়ি বিধান অনুযায়ী গোসল করাতে পারেন। সাহাবায়ে কেরামের আমল রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আবু বকর সিদ্দিক রযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস তাকে গোসল করিয়েছিলেন।[৯] এ বিষয়ে তাবেঈদেরও মত পাওয়া যায়। তবে মৃত স্ত্রীকে তার স্বামী গোসল করাতে পারবেন কি না, এমন প্রশ্নে ইসলামী ফিক্হবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর মত অনুযায়ী স্ত্রী মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই স্বামীর জন্য মৃত স্ত্রীকে গোসল করানো জায়েয নয়। কিন্তু অন্যান্যদের মতে যেমন ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ আরো অনেক আলেমের মতে, স্বামী জীবিত থাকতে স্ত্রী মারা গেলে তার মৃত স্ত্রীকে সে গোসল করাতে পারে। এ মতের পক্ষে সহীহ মারফূ দলীল রয়েছে। আয়েশা রযিয়াল্লাহু আনহা-কে উদ্দেশ করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لو مت قبلِي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك»

“তুমি যদি আমার আগে মৃত্যুবরণ করতে, তাহলে আমি নিজেই তোমাকে গোসল করাতাম এবং কাফন পরিয়ে দিতাম। অতঃপর আমি তোমার জানাযা সালাত আদায় তোমাকে দাফন করতাম”।[১০]

এই হাদিসকে অনেক ফকিহ স্বামীর জন্য মৃত স্ত্রীকে গোসল করানোর বৈধতার অন্যতম দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আলী রযিয়াল্লাহু আনহু-এর আমল দ্বারাও এটা সাব্যস্ত হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, আলী রযিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রী ফাতিমা রযিয়াল্লাহু আনহা-এর মৃত্যুর পর তাকে গোসল করিয়েছিলেন। তাই এ বিষয়ে মতভেদ ও বিভ্রান্তির দিকে না গিয়ে সহীহ সুন্নাহ, সাহাবী এবং অভিজ্ঞ আলেমদের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করাই উত্তম।

প্রশ্ন (১১) : বিতর সালাত আগে পড়ে ফেললে পরে কি তাহাজ্জুদ পড়া যাবে? এক্ষেত্রে তাহাজ্জুদের সময় বিতর পুনরায় পড়তে হবে কি?

লাবিব হাসান, বরিশাল

[৮] আশ-শারহুল মুমতিউ ২/২৭-২৮, ১২/২৪৬; মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৫৫; ফিক্বহুল ইবাদত পৃ. ২২৮।

[৯] মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ হা : ৩০৩।
[১০] সুনান ইবনে মাজাহ, হা : ১৪৬৫।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত হলো, তিনি রাতের সালাতের শেষে বিতর সালাত পড়তেন। তবে ইশার সালাতের পরপরই বিতর সালাত পড়ে নিলেও রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা যাবে। সুন্নাত হচ্ছে রাতের শেষ সালাত যেন বিতর সালাত হয়। নবী ﷺ বলেছেন,

«اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا»

“তোমরা তোমাদের রাতের শেষ সালাতকে বিতর হিসেবে নির্ধারণ করো”।[১১] এক্ষণে যে ব্যক্তি প্রথম রাতে বিতরের সালাত আদায় করেছে সে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে আর বিতর পড়বে না। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন, এক রাতে দু'বার বিতর সালাত নেই'।[১২]

☞ প্রশ্ন (১২) : কর্মক্ষেত্রে কিংবা মসজিদের বাইরে প্রয়োজনবশত সালাত জামা'আতে আদায় করলে আযান ও ইকামত দেওয়া কি জরুরি?

মো : জাফর, উত্তরা

উত্তর : জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করার সময় আযান ও ইক্বামত দেওয়া সুন্নাত। সালাত শুরু করার আগে তাদের একজন আযান ও ইকামত দিবে এবং আরেকজন ইমামতি করবে। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেন,

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

“যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন আযান দেয় এবং যে তোমাদের মধ্যে বয়সে বড় সে যেন ইমামতি করে”।[১৩]

☞ প্রশ্ন (১৩) : যে মহিলার নেসাব পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার আছে। কিন্তু যাকাত দেওয়ার মতো নগদ টাকা নেই। এমতাবস্থায় তার কি যাকাত প্রদান করতে হবে?

বেলাল হোসেন, কুমিল্লা

উত্তর : যদি কোনো মহিলার কাছে তার নিসাব পরিমাণ সোনার যাকাত দেওয়ার মতো নগদ অর্থ না থাকে, তাহলে তার জন্য কয়েকটি বিকল্প সমাধান রয়েছে।

১. তিনি যাকাত পরিশোধের জন্য তার স্বর্ণের কিছু অংশ বিক্রি করবেন।

২. সোনার একটি অংশ গরিবদের দান করতে পারেন। যদি গহনা ছাড়া তার অন্য কোনো সম্পদ না থাকে।

৩. তার স্বামী অথবা কোনো পুরুষ আত্মীয়ের যেমন তার বাবা, বা ভাই নিজ অর্থ থেকে তার পক্ষে যাকাত প্রদান করবেন।

৪. যাকাত প্রদানের জন্য তার অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করা উচিত।

৫. অর্থ জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত যাকাত প্রদান বিলম্বিত করবে। এ ক্ষেত্রে যাকাত একটি দেনা হিসেবেই থেকে যাবে, যতক্ষণ না তার কাছে তা পরিশোধ করার মতো নগদ অর্থ চলে আসে। এটি আল্লামা বিন বায ও বিন উসাইমীন রাহিমাহুমল্লাহসহ আরো কিছু আলেমের মত।

গুরুত্বপূর্ণ একটি নোট : উল্লেখ্য যে, 'সাজসজ্জা বা পরিধান করার জন্য যে গহনা সংগ্রহ করা হয়েছে, তার ওপর যাকাত প্রদানের বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ আলেম যেমন মালিকি, শাফিঈ এবং হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য নারীদের অর্জিত গহনার ওপর কোনো যাকাত নেই। কারণ, এ বিষয়ে সহীহ মারফূ কোনো হাদীস নেই। তবে সোনা পরিধানের জন্য না হয়ে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য হলে তার ওপর যাকাত ফরয।

স্বাস্থ্যই জীবনের আসল সম্পদ

“সুস্থ থাকুন, সুখে থাকুন।”

সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন, প্রতিদিন কিছুক্ষণ ব্যায়াম করুন, পর্যাপ্ত পানি পান করুন এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন। ছোট ছোট স্বাস্থ্যকর অভ্যাসই গড়ে তোলে একটি সুস্থ, সুন্দর ও প্রাণবন্ত জীবন।

---

[১১] সহীহ বুখারী হা : ৯৯৮।
[১২] আবূ দাউদ হা : ১৪৩৯; সহীহ জামে' হা : ৭৫৬৭।
[১৩] সহীহ বুখারী হা : ৬২৮।

"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"– প্রকাশিত বইসমূহ

নং	বই-এর নাম	লেখকের নাম	হাদীয়া
১	কালেমা তাইয়েবা	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী	২০/-
২	আহলে হাদীস পরিচিতি	"	১৪০/-
৩	নবুওয়াতে মুহাম্মাদী	"	৭০/-
৪	সিয়ামে রামাযান	"	৩২/-
৫	তারাবীহ	"	৩০/-
৬	ঈদে কুরবান	"	৪০/-
৭	তিন তালাক প্রসঙ্গ	"	১৫/-
৮	ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরণীয় ইমামগণের নীতি	"	৫০/-
৯	মুরগী আগে জন্মেছে না ডিম	"	২৪/-
১০	ফাতাওয়া ও মাসায়েল	"	১৭৫/-
১১	ইসলামী অর্থনীতির ক খ	"	১০০/-
১২	আহলে কিবলার পিছনে নামায	"	৭/-
১৩	ধর্ম বিজ্ঞান প্রগতি	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী	২০/-
১৪	বুলুগুল মারাম	অনুবাদ : মাও. আব্দুর রহমান	১০০/-
১৫	কিতাবুল কাবায়ির	"	৭০/-
১৬	নবুওয়াতী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান	প্রফেসর ড. সুলাইমান বিন হামাদ আল-আওদাহ	১০০/-
১৭	সহীহ আল্-কালিমুত্ তাইয়িব	শায়খ মুহাম্মদ নাসেরু-দ্-দীন আল্-আলবানী	৫০/-

বাৎসরিক ৩৬০/- (তিনশত ষাট টাকা) প্রদান করে মাসিক তর্জুমানুল হাদীস-এর গ্রাহক হোন!
কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক আলোকিত জীবন গড়ুন!!

দৃষ্টি আকর্ষণ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, মাসিক তর্জুমানুল হাদীস এবং সাপ্তাহিক আরাফাত-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রতিটি বিভাগের জন্য নির্ধারিত ফি, দান-অনুদানসহ যাবতীয় লেনদেন নিম্নবর্ণিত সংশ্লিষ্ট **ব্যাংক একাউন্ট**-এ পৃথকভাবে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ২৮৫৬
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫

"বিকাশ নম্বর"
০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে **০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।**

"মাসিক তর্জুমানুল হাদীস"
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ ও বিকাশ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

"সাপ্তাহিক আরাফাত"
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ১৩৩৫৯
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

The Monthly Tarjumanul Hadeeth Reg. DA. 142

আসসালামু আলাইকুম
আহলান ওয়া সাহলান। ইন শা-আল্লাহ
দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আপনার এই অনুদান
তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক কার্যক্রমকে করবে আরও বেগবান

জমঈয়ত কেন্দ্রীয় ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স
দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
ইসলামী ব্যাংক, নবাবপুর রোড শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত যাকাত ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স
দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ২০৫০১০২০২০০৬২০৮০৭
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, লোকাল অফিস, মতিঝিল শাখা।
bKash নগদ রকেট ০১৯৩৩৩৫৫৯০৪ (পার্সোনাল)

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড

ডিজিটাল দান বাক্স
দান করতে আপনার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ অথবা ব্যাংকিং অ্যাপ থেকে স্ক্যান করুন

ব্যাংক একাউন্ট: "জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড"
সঞ্চয়ী হিসাব নং: ৪০০৯১১১০০০১২২১৪
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা।
bKash নগদ ০১৯৩৩৩৫৫৯০২ (মার্চেন্ট)

আমাদের কর্মসূচি এবং প্রকল্পসমূহ

- দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা
- ইয়াতীমখানা পরিচালনা
- দুঃস্থ মুসলিম পুনর্বাসন
- নওমুসলিম পুনর্বাসন
- প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসন
- সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপন
- সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ
- আহলে হাদীস শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা
- পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ
- অনলাইন-অফলাইন দাওয়াতী প্রোগ্রাম
- আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন
- আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা
- দেশব্যাপী ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ
- গবেষণা ও ইসলামী বইপত্র প্রকাশ
- মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- কারিগরি কলেজ প্রকল্প
- ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা
- বিশ্বমানের জামি'আ আরাবিয়া প্রকল্প
- আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা
- শিশু ও বয়স্কদের জন্য মক্তব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা
- ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্প

BANGLADESH JAMIYAT AHL AL-HADITH, ESTD 1946

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

৭৯/ক/৩, জমঈয়ত ভবন, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
02 22 445 8551, 01933355901, jamiyat1946.bd@gmail.com www.jamiyat.org.bd

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষে সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক কর্তৃক ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা- ১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।